ঋতু-উৎসব

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশ্বভারতী-গ্রন্থালয়
২১৭, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

গ্রন্থ-সূচী

ঋতু-উৎসব

শেষ বর্ষণ

রাজা পারিষদবর্গ

নটরাজ, নাট্যাচার্য্য ও গায়ক-গায়িকা

গান আরম্ভ।

রাজা।

ওহে থামো, একটু থামো। আগে ব্যাপারখানা বুঝে নিই। নটরাজ, তোমাদের পালা গানের পুঁথি একখানা হাতে দাও না।

নটরাজ।

(পুঁথি দিয়া) এই নিন্ মহারাজ।

রাজা।

তোমাদের দেশের অক্ষর ভাল বুঝতে পারিনে। কী লিখ্ছে? "শেষ বর্ষণ"।

নটরাজ।

হাঁ মহারাজ।

রাজা।

আচ্ছা বেশ ভালো। কিন্তু পালাটা যার লেখা সে লোকটা কোথায়?

নটরাজ।

কাটা ধানের সঙ্গে সঙ্গে ক্ষেতটাকে তো কেউ ধরে আনে না। কাব্য লিখেই কবি খালাস, তার পরে জগতে তার মত অদরকারী আর কিছু নেই। আখের রসটা বেরিয়ে গেলে বাকি যা থাকে তাকে ঘরে রাখা চলে না। তাই সে পালিয়েছে।

রাজা।

পরিহাস ব'লে ঠেক্‌চে। একটু সোজা ভাষায় বলো। পালালো কেন?

নটরাজ।

পাছে মহারাজ ব'লে বসেন, ভাব, অর্থ, সুর, তান, লয়, কিছুই বোঝা যাচ্চে না সেই ভয়ে। লোকটা বড় ভীতু।

রাজ-কবি।

এ তো বড় কৌতুক! পাঁজিতে দেখা গেল তিথিটা পূর্ণিমা, এদিকে চাঁদ মেরেছেন দৌড়, পাছে কেউ ব'লে বসে তাঁর আলো ঝাপ্‌সা।

রাজা।

তোমাদের কবিশেখরের নাম শুনেই মধুকপত্তনের রাজার কাছ থেকে তাঁর গানের দলকে আনিয়ে নিলেম, আর তিনি পালালেন?

নটরাজ।

ক্ষতি হবে না, গানগুলো সুদ্ধ পালান নি। অস্তসূর্য্য নিজে লুকিয়েছেন কিন্তু মেঘে মেঘে রং ছড়িয়ে আছে।

রাজকবি।

তুমি বুঝি সেই মেঘ? কিন্তু তোমাকে দেখাচ্চে বড় সাদা।

নটরাজ।

ভয় নেই, এই সাদার ভিতর থেকেই ক্রমে ক্রমে রং খুল্‌তে থাক্‌বে।

রাজা।

কিন্তু আমার রাজবুদ্ধি, কবির বুদ্ধির সঙ্গে যদি না মেলে? আমাকে বোঝাবে কে?

নটরাজ।

সে ভার আমার উপর। ইসারায় বুঝিয়ে দেবো।

রাজা।

আমার কাছে ইসারা চলবে না। বিদ্যুতের ইসারার চেয়ে বজ্রের বাণী স্পষ্ট, তাতে ভুল বোঝার আশঙ্কা নেই। আমি স্পষ্ট কথা চাই। পালাটা আরম্ভ হবে কী দিয়ে?

নটরাজ।

বর্ষাকে আহ্বান ক'রে।

রাজা।

বর্ষাকে আহ্বান? এই আশ্বিন মাসে?

রাজ-কবি।

ঋতু-উৎসবের শব সাধনা? কবিশেখর ভূতকালকে খাড়া ক'রে তুলবেন! অদ্ভুত রসের কীর্ত্তন।

নটরাজ।

কবি বলেন, বর্ষাকে না জানলে শরৎকে চেনা যায় না। আগে আবরণ তারপরে আলো।

রাজা। (পারিষদের প্রতি)

মানে কী হে?

পারিষদ।

মহারাজ, আমি ওঁদের দেশের পরিচয় জানি। ওঁদের হেঁয়ালি বরঞ্চ বোঝা যায় কিন্তু যখন ব্যাখ্যা করতে বসেন তখন একেবারেই হাল ছেড়ে দিতে হয়।

রাজ-কবি।

যেন দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ, টান্‌লে আরও বাড়তে থাকে।

নটরাজ।

বোঝবার কঠিন চেষ্টা করবেন না মহারাজ, তা হোলেই সহজে বুঝবেন। জুঁই ফুলকে ছিঁড়ে দেখলে বোঝা যায় না, চেয়ে দেখলে বোঝা যায়। আদেশ করুন এখন বর্ষাকে ডাকি।

রাজা।

রোসো রোসো। বর্ষাকে ডাকা কি রকম? বর্ষা ত নিজেই ডাক দিয়ে আসে।

নটরাজ।

সে ত আসে বাইরের আকাশে। অন্তরের আকাশে তাকে গান গেয়ে ডেকে আনতে হয়।

রাজা।

গানের সুরগুলো কি কবিশেখরের নিজেরি বাঁধা?

নটরাজ।

হাঁ মহারাজ।

রাজা।

এই আর এক বিপদ।

রাজ-কবি।

নিজের অধিকারে পেয়ে কাব্যরসের হাতে কবি রাগিণীর দুর্গতি ঘটাবেন। এখন রাজার কর্ত্তব্য গীতসরস্বতীকে কাব্যপীড়ার হাত থেকে রক্ষা করা। মহারাজ, ভোজপুরের গন্ধর্ব্বদলকে খবর দিন না। দুই পক্ষের লড়াই বাধুক্ তা হ'লে কবির পক্ষে "শেষ বর্ষণ" নামটা সার্থক হবে।

নটরাজ।

রাগিণী যতদিন কুমারী ততদিন তিনি স্বতন্ত্রা, কাব্যরসের সঙ্গে পরিণয় ঘটলেই তখন ভাবের রসকেই পতিব্রতা মেনে চলে। উল্টে, রাগিণীর হুকুমে

ভাব যদি পায়ে পায়ে নাকে খৎ দিয়ে চলতে থাকে সেই স্ত্রৈণতা অসহ্য। অন্ততঃ আমার দেশের চাল এ রকম নয়।

রাজা।

ওহে নটরাজ, রস জিনিষটা স্পষ্ট নয়, রাগিণী জিনিষটা স্পষ্ট। রসের নাগাল যদি বা নাই পাই, রাগিণীটা বুঝি। তোমাদের কবি কাব্যশাসনে তাকেও যদি বেঁধে ফেলে তা হোলে তো আমার মতো লোকের মুস্কিল।

নটরাজ।

মহারাজ, গাঁঠছড়ার বাঁধন কি বাঁধন? সেই বাঁধনেই মিলন। তা'তে উভয়েই উভয়কে বাঁধে। কথায় সুরে হয় একাত্মা।

পারিষদ।

অলমতি বিস্তরেণ। তোমাদের ধর্ম্মে যা বলে তাই করো, আমরা বীরের মতো সহ্য ক'রবো।

নটরাজ। (গায়ক গায়িকাদের প্রতি)

ঘন মেঘে তাঁর চরণ পড়েছে। শ্রাবণের ধারায় তাঁর বাণী, কদম্বের বনে তাঁর গন্ধের অদৃশ্য উত্তরীয়। গানের আসনে তাঁকে বসাও, সুরে তিনি রূপ ধরুন, হৃদয়ে তাঁর সভা জমুক। ডাকো—

এসো নীপবনে ছায়াবীথিতলে,
এসো করো স্নান নবধারা জলে॥
দাও আকুলিয়া ঘন কালো কেশ,
পরো দেহ ঘেরি মেঘনীল বেশ;
কাজল নয়নে যূথীমালা গলে
এসো নীপবনে ছায়াবীথিতলে॥

আজি ক্ষণে ক্ষণে হাসিখানি, সখি,
অধরে নয়নে উঠুক চমকি।
মল্লার গানে তব মধুস্বরে
দিক্ বাণী আনি বনমর্ম্মরে।
ঘন বরিষণে জল-কলকলে
এসো নীপবনে ছায়াবীথিতলে॥

নটরাজ।

মহারাজ, এখন একবার ভিতরের দিকে তাকিয়ে দেখুন, 'রজনী শাঙন ঘন, ঘন দেয়া গরজন, রিমঝিম শবদে বরিষে'।

রাজা।

ভিতরের দিকে? সেই দিকের পথই তো সব চেয়ে দুর্গম।

নটরাজ।

গানের স্রোতে হাল ছেড়ে দিন, সুগম হবে। অনুভব করচেন কি, প্রাণের আকাশে পূব হাওয়া মুখর হয়ে উঠ্‌ল। বিরহের অন্ধকার ঘনিয়েছে। ওগো সব গীতরসিক, আকাশের বেদনার সঙ্গে হৃদয়ের রাগিণীর মিল করো। ধরো ধরো, 'ঝরে ঝর ঝর'।

ঝরে ঝর ঝর ভাদর বাদর,
বিরহকাতর শর্ব্বরী।
ফিরিছে এ কোন্ অসীম রোদন
কানন কানন মর্ম্মরি॥
আমার প্রাণের রাগিণী আজি এ
গগনে গগনে উঠিল বাজিয়ে।

হৃদয় একি রে ব্যাপিল তিমিরে
সমীরে সমীরে সঞ্চরি ॥

নটরাজ।

শ্রাবণ ঘরছাড়া উদাসী। আলুথালু তার জটা, চোখে তার বিদ্যুৎ। অশ্রান্ত ধারার একতারায় একই সুর সে বাজিয়ে বাজিয়ে সারা হোলো। পথহারা তার সব কথা বলে শেষ করতে পা'রলে না। ঐ শুনুন মহারাজ মেঘমল্লার।

কোথা যে উধাও হোলো মোর প্রাণ উদাসী
আজি ভরা বাদরে ॥
ঘন ঘন গুরু গুরু গরজিছে,
ঝরঝর নামে দিকে দিগন্তে জলধারা,
মন ছুটে শূন্যে শূন্যে অনন্তে
অশান্ত বাতাসে ॥

রাজা।

পূব দিকটা আলো হয়ে উঠ্‌লো যে, কে আসে?

নটরাজ।

শ্রাবণের পূর্ণিমা।

রাজ-কবি।

শ্রাবণের পূর্ণিমা! হাঃ হাঃ হাঃ। কালো খাপটাই দেখা যাবে, তলোয়ারটা রইবে ইসারায়।

রাজা।

নটরাজ, শ্রাবণের পূর্ণিমায় পূর্ণতা কোথায়? ও ত বসন্তের পূর্ণিমা নয়।

নটরাজ।

মহারাজ, বসন্ত পূর্ণিমাই ত অপূর্ণ। তাতে চোখের জল নেই কেবলমাত্র হাসি। শ্রাবণের শুক্ল রাতে হাসি বলচে আমার জিৎ, কান্না বলচে আমার। ফুল ফোটার সঙ্গে ফুল ঝরার মালা-বদল। ওগো কলস্বরা, পূর্ণিমার ডালাটি খুলে দেখো, ও কী আন্‌লে?

আজ শ্রাবণের পূর্ণিমাতে কী এনেছিস্ বল্,
হাসির কানায় কানায় ভরা কোন্ নয়নের জল॥
বাদল-হাওয়ার দীর্ঘশ্বাসে
যূথীবনের বেদন আসে,
ফুল-ফোটানোর খেলায় কেন ফুল-ঝরানোর ছল॥
কী আবেশ হেরি চাঁদের চোখে,
ফেরে সে কোন্ স্বপন লোকে।
মন বসে রয় পথের ধারে,
জানে না সে পাবে কারে,
আসা-যাওয়ার আভাস ভাসে বাতাসে চঞ্চল॥

রাজা।

বেশ, বেশ, এটা মধুর লাগলো বটে।

নটরাজ।

কিন্তু মহারাজ, কেবলমাত্র মধুর? সেও তো অসম্পূর্ণ?

রাজা।

ঐ দেখো, যেমনি আমি বলেছি মধুর অমনি তার প্রতিবাদ। তোমাদের দেশে সোজা কথার চলন নেই বুঝি?

নটরাজ।

মধুরের সঙ্গে কঠোরের মিলন হোলে তবেই হয় হরপার্ব্বতীর মিলন। সেই মিলনের গানটা ধরো।

বজ্র-মাণিক দিয়ে গাঁথা
আষাঢ় তোমার মালা।
তোমার শ্যামল শোভার বুকে
বিদ্যুতেরি জ্বালা॥
তোমার মন্ত্রবলে
পাষাণ গলে, ফসল ফলে,
মরু বহে আনে তোমার পায়ে ফুলের ডালা॥
মরমর পাতায় পাতায়
ঝরঝর বারির রবে,
গুরুগুরু মেঘের মাদল
বাজে তোমার কী উৎসবে?
সবুজ সুধার ধারায় ধারায়
প্রাণ এনে দাও তপ্ত ধরায়,
বামে রাখ ভয়ঙ্করী
বন্যা মরণ ঢালা॥

রাজা।

সব রকমের ক্ষ্যাপামিই ত হোলো। হাসির সঙ্গে কান্না, মধুরের সঙ্গে কঠোর, এখন বাকি রইলো কী?

নটরাজ।

বাকি আছে অকারণ উৎকণ্ঠা। কালিদাস বলেন, মেঘ দেখলে সুখী মানুষও আন্‌মনা হয়ে যায়। এইবার সেই যে "অন্যথাবৃত্তি চেতঃ", সেই যে পথ-চেয়ে-থাকা আন্‌মনা, তারই গান হবে। নাট্যাচার্য্য, ধরো হে,—

পূব হাওয়াতে দেয় দোলা আজ মরি মরি।
হৃদয়-নদীর কূলে কূলে জাগে লহরী॥
পথ চেয়ে তাই একলা ঘাটে
বিনা কাজে সময় কাটে,
পাল তুলে ঐ আসে তোমার সুরেরই তরী॥
ব্যথা আমার কূল মানে না বাধা মানে না,
পরাণ আমার ঘুম জানে না জাগা জানে না।
মিল্‌বে যে আজ অকূল পানে,
তোমার গানে আমার গানে,
ভেসে যাবে রসের বাণে আজ বিভাবরী॥

নটরাজ।

বিরহীর বেদনা রূপ ধ'রে দাঁড়ালো, ঘন বর্ষার মেঘ আর ছায়া দিয়ে গড়া সজল রূপ। অশান্ত বাতাসে ওর সুর পাওয়া গেলো কিন্তু ওর বাণীটি আছে, তোমার কণ্ঠে মধুরিকা।

অশ্রুভরা বেদনা দিকে দিকে জাগে।
আজি শ্যামল মেঘের মাঝে
বাজে কার কামনা॥
চলিছে ছুটিয়া অশান্ত বায়,

ক্রন্দন কা'র তার গানে ধ্বনিছে,
করে কে সে বিরহী বিফল সাধনা ॥

রাজা।

আর নয় নটরাজ, বিরহের পালাটাই বড় বেশী হয়ে উঠ্‌লো, ওজন ঠিক থাকৃচে না।

নটরাজ।

মহারাজ, রসের ওজন আয়তনে নয়। সমস্ত গাছ একদিকে, একটি ফুল একদিকে, তবু ওজন ঠিক থাকে। অসীম অন্ধকার একদিকে, একটি তারা একদিকে, তাতেও ওজনের ভুল হয় না। ভেবে দেখুন, এ সংসারে বিরহের সরোবর চারিদিকে ছলছল করচে, মিলনপদ্মটি তারই বুকের একটি দুর্লভ ধন।

রাজ-কবি।

তাই না হয় হোলো। কিন্তু অশ্রু বাষ্পের কুয়াশা ঘনিয়ে দিয়ে সেই পদ্মটিকে একেবারে লুকিয়ে ফেল্‌লে ত চ'ল্‌বে না।

নটরাজ।

মিলনের আয়োজনও আছে। খুব বড় মিলন, অবনীর সঙ্গে গগনের। নাট্যাচার্য্য একবার শুনিয়ে দাও ত।

ধরণীর গগনের মিলনের ছন্দে
বাদল বাতাস মাতে মালতীর গন্ধে ॥
উৎসব সভা মাঝে
শ্রাবণের বীণা বাজে,
শিহরে শ্যামল মাটি প্রাণের আনন্দে ॥

দুই কূল আকুলিয়া অধীর বিভঙ্গে
নাচন উঠিল জেগে নদীর তরঙ্গে।
কাঁপিছে বনের হিয়া
বরষণে মুখরিয়া,
বিজলি ঝলিয়া উঠে নবঘন মন্দ্রে॥

রাজা।

আঃ, এতক্ষণে একটু উৎসাহ লাগলো। থাম্‌লে চলবে না। দেখ না, তোমাদের মাদলওয়ালার হাত দুটো অস্থির হয়েছে, ওকে একটু কাজ দাও।

নটরাজ।

বলি ও ওস্তাদ, ঐ যে দলে দলে মেঘ এসে জুটলো, ওরা যে ক্ষ্যাপার মত চলেছে। ওদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলো না, একেবারে মৃদঙ্গ বাজিয়ে বুক ফুলিয়ে যাত্রা জ'মে উঠুক্ না সুরে, কথায়, মেঘে, বিদ্যুতে, ঝড়।

পথিক মেঘের দল জোটে ঐ শ্রাবণ গগন অঙ্গনে।
মন রে আমার, উধাও হয়ে নিরুদ্দেশের সঙ্গ নে॥
দিক-হারানো দুঃসাহসে
সকল বাঁধন পড়ুক খসে,
কিসের বাধা ঘরের কোণের শাসন-সীমা লঙ্ঘনে॥
বেদনা তোর বিজুলশিখা জ্বলুক অন্তরে।
সর্ব্বনাশের করিস্ সাধন বজ্র-মন্তরে;
অজানাতে করবি গাহন,
ঝড় সে পথের হবে বাহন,
শেষ করে দিস আপনারে তুই
প্রলয় রাতের ক্রন্দনে॥

রাজ-কবি।

ঐরে আবার ঘুরে ফিরে এলেন সেই 'অজানা' সেই তোমার 'নিরুদ্দেশ'। হারাজ, আর দেরী নেই, আবার কান্না নামলো ব'লে।

নটরাজ।

ঠিক ঠাউরেছ। বোধ হচ্চে চোখের জলেরই জিৎ। বর্ষার রাতে সাথী-হারার স্বপ্নে অজানা বন্ধু ছিলেন অন্ধকার ছায়ায় স্বপ্নের মতো; আজ বুঝি। শ্রাবণের প্রাতে চোখের জলে ধরা দিলেন। মধুরিকা, ভৈরবীতে করুণ র লাগাও, তিনি তোমার হৃদয়ে কথা কবেন।

বন্ধু, রহো রহো সাথে
আজি এ সঘন শ্রাবণ প্রাতে ॥
ছিলে কি মোর স্বপনে
সাথীহারা রাতে ॥
বন্ধু, বেলা বৃথা যায় রে
আজি এ বাদলে আকুল হাওয়ায় রে।
কথা কও মোর হৃদয়ে
হাত রাখো হাতে ॥

রাজা।

কান্না হাসি বিরহ মিলন সব রকমই ত খণ্ড খণ্ড ক'রে হোলো, এইবার বর্ষার একটা পরিপূর্ণ মূর্ত্তি দেখাও দেখি।

নটরাজ।

ভালো কথা মনে করিয়ে দিলেন মহারাজ। নাট্যাচার্য্য, তবে ঐটে সুরু করো।

ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব হরষে,
জলসিঞ্চিত ক্ষিতি-সৌরভ-রভসে,
ঘন গৌরবে নব-যৌবনা বরষা,
শ্যাম গম্ভীর সরসা।
গুরু গর্জ্জনে নীল অরণ্য শিহরে
উতলা কলাপী কেকা-কলরবে বিহরে ;
নিখিল-চিত্ত হরষা
ঘন গৌরবে আসিছে মত্ত বরষা ॥

কোথা তোরা অয়ি তরুণী পথিক-ললনা,
জনপদবধূ তড়িৎ-চকিত-নয়না,
মালতী-মালিনী কোথা প্রিয়-পরিচারিকা,
কোথা তোরা অভিসারিকা।
ঘনবনতলে এসো ঘননীলবসনা,
ললিত নৃত্যে বাজুক স্বর্ণরশনা,
আনো বীণা মনোহারিকা।
কোথা বিরহিণী, কোথা তোরা অভিসারিকা ॥

আনো মৃদঙ্গ, মুরজ, মুরলী মধুরা,
বাজাও শঙ্খ, হুলুরব করো বধূরা,
এসেছে বরষা, ওগো নব অনুরাগিণী,
ওগো প্রিয়সুখভাগিনী।
কুঞ্জকুটীরে, অয়ি ভাবাকুললোচনা,
ভূর্জ্জ পাতায় করো নবগীত রচনা

মেঘমল্লার রাগিণী।

এসেছে বরষা, ওগো নব অনুরাগিণী ॥
কেতকীকেশরে কেশপাশ করো সুরভী,
ক্ষীণ কটিতটে গাঁথি ল'য়ে পরো করবী,
কদম্বরেণু বিছাইয়া দাও শয়নে,
অঞ্জন আঁকো নয়নে।

তালে তালে দুটি কঙ্কণ কনকনিয়া
ভবন শিখীরে নাচাও গণিয়া গণিয়া
স্মিত-বিকসিত বয়নে ;
কদম্বরেণু বিছাইয়া ফুল-শয়নে ॥

এসেছে বরষা, এসেছে নবীনা বরষা,
গগন ভরিয়া এসেছে ভুবন-ভরসা,
দুলিছে পবনে সন সন বন-বীথিকা,
গীতময় তরুলতিকা।

শতেক যুগের কবিদলে মিলি আকাশে
ধ্বনিয়া তুলিছে মত্তমদির বাতাসে
শতেক যুগের গীতিকা,
শত শত গীত-মুখরিত বন-বীথিকা ॥

রাজা।

বাঃ, বেশ জমেছে। আমি বলি আজকের মত বাদলের পালাই চলুক।

সাজ্‌বে বাদল সোনার সাজে আকাশ মাঝে
কালিমা ওর ঘুচিয়ে ফেলে” ॥

নটরাজ।

শরতের প্রথম প্রত্যুষে ঐ যে শুকতারা দেখা দিলো অন্ধকারের প্রান্তে। মহারাজ দয়া করবেন, কথা কবেন না।

রাজা।

নটরাজ, তুমিও ত কথা কইতে কসুর করো না।

নটরাজ।

আমার কথা যে পালারই অঙ্গ।

রাজা।

আর আমার হোলো তার বাধা। তোমার যদি হয় জলের ধারা, আমার না হয় হোলো নুড়ি, দুইয়ে মিলেই তো ঝরণা। সৃষ্টিতে বাধা যে প্রকাশেরই অঙ্গ। যে বিধাতা রসিকের সৃষ্টি করেছেন অরসিক তাঁরই সৃষ্টি, সেটা রসেরই প্রয়োজনে।

নটরাজ।

এবার বুঝেছি আপনি ছদ্মরসিক, বাধার ছলে রস নিংড়ে বের করেন। আর আমার ভয় রইলো না। গীতাচার্য্য গান ধরো।

দেখো শুকতারা আঁখি মেলি চায়
প্রভাতের কিনারায়।
ডাক দিয়েছে রে শিউলি ফুলেরে
আয় আয় আয় ॥
ও যে কার লাগি জ্বালে দীপ,
কার ললাটে পরায় টীপ,

ও যে কার আগমনী গায়—
আয় আয় আয় ॥
জাগো জাগো, সখি,
কাহার আশায় আকাশ উঠিল পুলকি'।
মালতীর বনে বনে
ঐ শোনো ক্ষণে ক্ষণে
কহিছে শিশির বায়
আয় আয় আয় ॥

নটরাজ।

ঐ দেখুন শুকতারার ডাক পৃথিবীর বনে পৌচেছে। আকাশে আলোকের যে লিপি সেই লিপিটিকে ভাষান্তরে লিখে দিলো ঐ শেফালি। সে লেখার শেষ নেই, তাই বারে বারেই অশ্রান্ত ঝরা আর ফোটা। দেবতার বাণীকে যে এনেছে মর্ত্ত্যে, তার ব্যথা ক'জন বোঝে? সেই করুণার গান সন্ধ্যার সুরে তোমরা ধরো।

ওলো শেফালি,
সবুজ ছায়ার প্রদোষে তুই জ্বালিস দীপালি ॥
তারার বাণী আকাশ থেকে
তোমার রূপে দিলো এঁকে
শ্যামল পাতায় থরে থরে আখর রূপালি ॥
বুকের খসা গন্ধ আঁচল রইলো পাতা সে
কানন বীথির গোপন কোণের বিবশ বাতাসে।

সারাটা দিন বাটে বাটে
নানা কাজে দিবস কাটে,
আমার সাঁঝে বাজে তোমার করুণ ভূপালি ॥

রাজা।

নটরাজ, অমন শুকতারাতে শেফালিতে ভাগ ক'রে ক'রে শরৎকে দেখাবে কেমন করে ?

নটরাজ।

আর দেরি নেই, কবি ফাঁদ পেতেছে। যে মাধুরী হাওয়ায় হাওয়ায় আভাসে ভেসে বেড়ায় সেই ছায়া-রূপটিকে ধরেছে কবি আপন গানে। সেই ছায়া-রূপিণীর নূপুর বাজলো, কঙ্কণ চমক দিলো কবির স্বরে, সেই স্বরটিকে তোমাদের কণ্ঠে জাগাও তো।

যে-ছায়ারে ধরব ব'লে করেছিলেম পণ
আজ সে মেনে নিল আমার গানেরি বন্ধন ॥
আকাশে যার পরশ মিলায়
শরৎ মেঘের ক্ষণিক লীলায়
আপন সুরে আজ শুনি তার নূপুর গুঞ্জন ॥
অলস দিনের হাওয়ায়
গন্ধখানি মেলে যেত' গোপন আসা যাওয়ায়।
আজ শরতের ছায়ানটে
মোর রাগিণীর মিলন ঘটে,
সেই মিলনের তালে তালে বাজায় সে কঙ্কণ ॥

নটরাজ।

শুভ্র শান্তির মূর্ত্তি ধ'রে এইবার আসুন শরৎশ্রী। সজল হাওয়ার দোল থেমে যাক্—আকাশে আলোক-শতদলের উপর তিনি চরণ রাখুন, দিকে দিগন্তে সে বিকশিত হয়ে উঠুক।

এসো শরতের অমল মহিমা,
এসো হে ধীরে।
চিত্ত বিকাশিবে চরণ ঘিরে॥
বিরহ-তরঙ্গে অকূলে সে দোলে
দিবা যামিনী আকুল সমীরে॥

(বাদল লক্ষ্মীর প্রবেশ।)

রাজা।

ও কী হল নটরাজ, সেই বাদললক্ষ্মীই ত ফিরে এলেন; মাথায় সেই অবগুণ্ঠন। রাজার মানই ত রইল, কবি তো শরৎকে আনতে পারলেন না।

নটরাজ।

চিনতে সময় লাগে মহারাজ। ভোর রাত্রিকেও নিশীথ রাত্রি ব'লে ভুল হয়। কিন্তু ভোরের পাখীর কাছে কিছুই লুকোনো থাকে না; অন্ধকারের মধ্যেই সে আলোর গান গেয়ে ওঠে। বাদলের ছলনার ভিতর থেকেই কবি শরৎকে চিনেছে, তাই আমন্ত্রণের গান ধরল।

ওগো শেফালি বনের মনের কামনা,
কেন সুদূর গগনে গগনে
আছ মিলায়ে পবনে পবনে?
কেন কিরণে কিরণে ঝলিয়া
যাও শিশিরে শিশিরে গলিয়া?

কেন চপল আলোতে ছায়াতে
আছ লুকায়ে আপন মায়াতে ?
তুমি মূরতি ধরিয়া চকিতে নামো না ॥

আজি মাঠে মাঠে চলো বিহরি,
তৃণ উঠুক শিহরি শিহরি।
নামো তালপল্লব-বীজনে,
নামো জলে ছায়া-ছবি সৃজনে,
এসো সৌরভ ভরি আঁচলে,
আঁখি আঁকিয়া সুনীল কাজলে,
মম চোখের সমুখে ক্ষণেক থামো না ॥

ওগো সোনার স্বপন সাধের সাধনা।
কত আকুল হাসি ও রোদনে,
রাতে দিবসে স্বপনে বোধনে,
জ্বালি' জোনাকি প্রদীপ-মালিকা,
ভরি নিশীথ-তিমির থালিকা,
প্রাতে কুসুমের সাজি সাজায়ে,
সাঁজে ঝিল্লি ঝাঁঝর বাজায়ে,
কত করেছে তোমার স্তুতি-আরাধনা ॥

ওগো সোনার স্বপন, সাধের সাধনা।
ঐ বসেছ শুভ্র আসনে
আজি নিখিলের সম্ভাষণে।

আহা, শ্বেতচন্দন তিলকে
আজি তোমারে সাজায়ে দিলো কে ?
আহা বরিলো তোমারে কে আজি
তা'র দুঃখ-শয়ন তেয়াজি',
তুমি ঘুচালে কাহার বিরহ-কাঁদনা ॥

নটরাজ।

প্রিয়দর্শিকা, সময় হয়েছে, এইবার বাদল লক্ষ্মীর অবগুণ্ঠন খুলে দেখো। চিনতে পারবে সেই ছদ্মবেশিনীই শরৎপ্রতিমা। বর্ষার ধারায় যাঁর কণ্ঠ গদগদ, শিউলি বনে তাঁরই গান, মালতী বিতানে তাঁরই বাঁশির ধ্বনি।

এবার অবগুণ্ঠন খোলো।
গহন মেঘমায়ায় বিজন বনছায়ায়
তোমার আলসে অবগুণ্ঠন সারা হোলো ॥
শিউলি-সুরভি রাতে
বিকশিত জ্যোৎস্নাতে
মৃদু মর্ম্মর গানে তব মর্ম্মের বাণী বোলো ॥
গোপন অশ্রুজলে মিলুক সরম হাসি—
মালতী বিতানতলে বাজুক বঁধূর বাঁশি।
শিশিরসিক্ত বায়ে
বিজড়িত আলো ছায়ে
বিরহ-মিলনে গাঁথা নব
প্রণয়-দোলায় দোলো ॥

(অবগুণ্ঠন মোচন)

নটরাজ।

অবগুণ্ঠন ত খুললো। কিন্তু এ কী দেখলুম। এ কি রূপ, না বাণী? এ কি আমার মনেরি মধ্যে, না আমার চোখেরই সাম্‌নে?

তোমার নাম জানিনে সুর জানি।
তুমি শরৎ প্রাতের আলোর বাণী॥
সারা বেলা শিউলি বনে
আছি মগন আপন মনে,
কিসের ভুলে রেখে গেলে
আমার ব্যথার বাঁশিখানি॥
আমি যা বলিতে চাই হোলো বলা,
ঐ শিশিরে শিশিরে অশ্রুগলা।
আমি যা দেখিতে চাই প্রাণের মাঝে
সেই মূরতি এই বিরাজে,
ছায়াতে আলোতে আঁচল গাঁথা
আমার অকারণ বেদনার বীণাপাণি॥

রাজা।

শরৎশ্রী কা'কে ইসারা ক'রে ডাকচে? বলো ত এবার কে আস্‌বে?

নটরাজ।

উনি ডাক্‌চেন সুন্দরকে। যা ছিলো ছায়ার কুঁড়ি তা ফুট্‌লো আলোর ফুলে। গানের ভিতর দিয়ে তাকিয়ে দেখুন।

(সুন্দরের প্রবেশ)

কার বাঁশি নিশিভোরে বাজিল মোর প্রাণে?
ফুটে দিগন্তে অরুণ-কিরণ-কলিকা॥

শরতের আলোতে সুন্দর আসে,
ধরণীর আঁখি যে শিশিরে ভাসে,
হৃদয় কুঞ্জবনে মঞ্জরিল
মধুর শেফালিকা ॥

রাজা।

নটরাজ, শরৎলক্ষ্মীর সহচরটি এরি মধ্যে চঞ্চল হ'য়ে উঠলেন কেন?

নটরাজ।

শিশির শুকিয়ে যায়, শিউলি ঝ'রে পড়ে, আশ্বিনের সাদা মেঘ আলোয় যায় মিলিয়ে। ক্ষণিকের অতিথি স্বর্গ থেকে মর্ত্ত্যে আসেন। কাঁদিয়ে দিয়ে চ'লে যান। এই যাওয়া আসায় স্বর্গ মর্ত্ত্যের মিলন-পথ বিরহের ভিতর দিয়ে খুলে যায়।

হে ক্ষণিকের অতিথি,
এলে প্রভাতে কারে চাহিয়া,
ঝরা শেফালির পথ বাহিয়া ॥
কোন্ অমরার বিরহিণীরে
চাহনি ফিরে,
কার বিষাদের শিশির নীরে
এলে নাহিয়া ॥
ওগো অকরুণ, কী মায়া জানো,
মিলন ছলে বিরহ আনো।
চলেছ পথিক আলোক-যানে
আঁধার পানে,

মন-ভুলানো মোহন তানে
গান গাহিয়া ॥

নটরাজ।

এইবার কবির বিদায় গান। বাঁশি হবে নীরব। যদি কিছু বাকি থাকে সে থাকবে স্মরণের মধ্যে।

আমার রাত পোহালো শারদ প্রাতে।
বাঁশি, তোমায় দিয়ে যাব কাহার হাতে ॥
তোমার বুকে বাজ্‌লো ধ্বনি
বিদায়-গাথা, আগমনী, কত যে,
ফাল্গুনে শ্রাবণে, কত প্রভাতে রাতে ॥
যে কথা রয় প্রাণের ভিতর অগোচরে
গানে গানে নিয়েছিলে চুরি ক'রে।
সময় যে তা'র হোলো গত
নিশিশেষের তারার মতো
তারে শেষ ক'রে দাও শিউলি ফুলের মরণ সাথে ॥

রাজা।

ও কি! একেবারেই শেষ হয়ে গেলো নাকি? কেবল ত্বদণ্ডের জন্যে গান বাঁধা হোলো, গান সারা হোলো! এত সাধনা, এত আয়োজন, এত উৎকণ্ঠা,—তারপরে?

নটরাজ।

"তারপরে" প্রশ্নের উত্তর নেই সব চুপ। এই তো সৃষ্টির লীলা। এ তো কৃপণের পুঁজি নয়। এ যে আনন্দের অমিত ব্যয়। মুকুল ধরেও যেমন ঝরেও

তেমনি। বাঁশীতে যদি গান বেজে থাকে সেই তো চরম। তারপরে? কে চুপ ক'রে শোনে, কেউ গলা ছেড়ে তর্ক করে। কেউ মনে রাখে, কে ভোলে, কেউ ব্যঙ্গ করে। তাতে কী আসে যায়?

গান আমার যায় ভেসে যায়,
চাস্‌নে ফিরে দে তা'রে বিদায়॥
সে যে দখিন হাওয়ায় মুকুল ঝরা,
ধূলার আঁচল হেলায় ভরা,
সে যে শিশির ফোঁটার মালা গাঁথা বনের আঙিনায়॥
কাঁদন হাসির আলোছায়া সারা অলস বেলা,
মেঘের গায়ে রঙের মায়া খেলার পরে খেলা।
ভুলে যাওয়ার বোঝাই ভরি
গেলো চ'লে কতই তরী
উজান বায়ে ফেরে যদি কে রয় সে আশায়॥

রাজা।

উত্তম হয়েছে।

রাজ-কবি।

আ অনেক উত্তম হ'তে পারত।

শারদোৎসব

শারদোৎসব

ভূমিকা

রাজা। আমাদের সব প্রস্তুত তো?

মন্ত্রী। হাঁ মহারাজ, এক রকম প্রস্তুত, কিন্তু—

রাজা। কিন্তু! কিন্তু আবার কিসের? আমাদের শারদ-উৎসবের ভিতরেও কিন্তু এসে পড়ে! এ তো রাষ্ট্রনীতি নয়।

মন্ত্রী। উৎসবের আয়োজনের মধ্যে একটি কবি আছেন যে, কাজেই কিন্তুর অভাব হয় না।

রাজা। আমাদের কবিশেখরের কথা বল্‌ছো? তা তাঁর উপরে তো ভার ছিল উৎসব উপলক্ষে একটা যাত্রার পালা তৈরি করবার জন্যে।

মন্ত্রী। আপনি তো তাঁকে জানেন, সুবিধা, অসুবিধা, স্থান, কাল, পাত্র এ সবের দিকে তাঁর একেবারেই দৃষ্টি নেই। তিনি আপন খেয়াল মতোই চলেন।

রাজা। তা হয়েছে কী, লোকটা পালিয়েছে না কি?

মন্ত্রী। একরকম পালানোই বই কী। সভাপণ্ডিত মশায় ঠিক ক'রে দিয়েছিলেন, এবারকার উৎসবের জন্যে শুম্ভ-নিশুম্ভ বধের পালা তৈরি ক'রে দিতে হবে। একথা হয়েছিল মহাদ্বাদশীর দিনে। কাল শুনি কবি সে পালা তৈরিই করে নি।

রাজা। কী সর্ব্বনাশ; এ মানুষকে নিয়ে দেখচি আর চল্লো না। সখা, তুমি কেনারাম পাঁচালি-ওয়ালার উপর ভার দিলে না কেন—তা হলে তো এ বিভ্রাট ঘট্‌তো না। পুরবাসীরা সবাই এসে জুটেছেন, এখন উপায়?

মন্ত্রী। কবি বল্‌চেন, তিনি তাঁর মনের মতো ছোট একটা পালা লিখেছেন।

রাজা। তাতে আছে কী ?

মন্ত্রী। তা তো বল্‌তে পারিনে। সংক্ষেপে যা বর্ণনা কর্‌লেন তাতে ভাবটা কিছুই বুঝতে পারলেম না। বল্‌লেন যে, সেটা [illegible]তে গন্ধেতে রঙেতে রসেতে মিশিয়ে একটা কিছুইনা-গোছের জিনিষ।

রাজা। কিছুইনা-গোছের জিনিষ ! এ কি পরিহাস ?

মন্ত্রী। শুধু পরিহাস নয়, মহারাজ, এ দুর্দ্দৈব।

রাজা। তাতে গল্প কিছু আছে ?

মন্ত্রী। নেই বল্লেই হয়।

রাজা। যুদ্ধ ?

মন্ত্রী। না।

রাজা। কোনো রকমের রক্তপাত ?

মন্ত্রী। না।

রাজা। আত্মহত্যা ? পতন ও মূর্চ্ছা ?

মন্ত্রী। একেবারেই না।

রাজা। আদিরস ? বীররস ? করুণরস ?

মন্ত্রী। না, কোনটাই না। কবি বলেন, তিনি যা রচনা করেছেন, তা শরৎকালের উপযোগী খুব হাল্কা রকমের ব্যাপার। তার মধ্যে ভার একটুও নেই।

রাজা। তাকে শরৎকালের উপযোগী বল্‌বার মানে কী হল ?

মন্ত্রী। কবি বলেন, শরৎকালের মেঘ যে হাল্কা, তার কোন প্রয়োজন নেই, তার জলভার নেই, সে নিঃসম্বল সন্ন্যাসী।

রাজা। এ কথা সত্য বটে।

মন্ত্রী। কবি বলেন, শরৎকালের শিউলিফুলের মধ্যে যেন কোন আসক্তি নেই, যেমন সে ফোটে তেমনি সে ঝ'রে পড়ে।

রাজা। একথা মান্‌তে হয়।

মন্ত্রী। কবি বলেন, শরৎকালের কাশের স্তবক না বাগানের না বনের ; সে হেলাফেলায় মাঠে ঘাটে নিজের অকিঞ্চনতার ঐশ্বর্য্য বিস্তার ক'রে বেড়াচ্ছে। সে সন্ন্যাসী।

রাজা। এ কথা কবি বেশ বলেছে।

মন্ত্রী। কবি বলেন, শরতে কাঁচা ধানের যে ক্ষেত দেখি, কেবল আছে তার রং, কেবল আছে তার দোলা। আর কোনো দায় যদি তার থাকে সে কথা সে একেবারে লুকিয়েচে।

রাজা। ঠিক কথা।

মন্ত্রী। তাই কবি বলেন, তাঁর শারদোৎসবের যে পালা সে ঐ রকমই হাল্কা, ঐ রকমই নিরর্থক। সে পালায় কাজের কথা নেই, সে পালায় আছে ছুটির খুসি।

রাজা। বাঃ, এ তো মন্দ শোনাচ্ছে না! ওর মধ্যে রাজা কেউ আছে?

মন্ত্রী। একজন আছেন। কিন্তু তিনি কিছুদিনের জন্যে রাজত্ব থেকে ছুটি নিয়ে সন্ন্যাসী বেশে মাঠে ঘাটে বিনা কাজে দিন কাটিয়ে বেড়াচ্ছেন।

রাজা। বাঃ বাঃ, শুনে লোভ হয় যে! আর কে আছে?

মন্ত্রী। আর আছে সব ছেলের দল।

রাজা। ছেলের দল? তাদের নিয়ে কী হবে?

মন্ত্রী। কবি বলেন, ঐ ছেলেদের প্রাণের মধ্যেই তো আসল ছুটির চেহারা! তারা কাঁচা ধানের ক্ষেতের মতোই নিজে না জেনে, কাউকে না জানিয়ে, ছুটির ভিতরেই, ফসলের আয়োজন কর্‌ছে।

রাজা। তা ঐ ছেলের দলকে ভাল ক'রে শেখান হয়েছে?

মন্ত্রী। একেবারেই না।

রাজা। কী সর্ব্বনাশ। তা হলে—

মন্ত্রী। কবি বলেন, বুড়োরা ছেলেদের যদি শেখাতে যায় তা হলে তো ছেলেরা পেকে যাবে—ছেলেই থাকবে না। সেই জন্যে ওদের নাট্য শেখানই হয় নি। কবি বলেন, সহজে খুসি হবার বিদ্যে ওদের কাছ থেকে আমরাই শিখ্‌বো।

রাজা। কিন্তু, মন্ত্রী, সহজে খুসী হবার বিদ্যা তো পুরবাসীদের বিদ্যা নয়। এই সব হাল্কা, এই সব কাঁচা, এই সব না-শেখা ব্যাপারের মূল্য কি তাঁদের কাছে আছে?

মন্ত্রী। সে কথা আমি কবিকে জিজ্ঞাসা করেছিলুম্—তিনি বল্‌লেন, ওজন যার কিছু নেই তার আবার মূল্য কিসের? হেমন্তের পাকা ধানেরই মূল্য আছে, ভাদ্রের কাঁচা ক্ষেতের আবার মূল্য কি? একটুখানি হাসি, একটুখানি খুসি, এই হলেই দেনা পাওনা চুকে যাবে।

রাজা। আচ্ছা বেশ, শুম্ভ-নিশুম্ভ তা হলে এখন থাক্—আসুক ছেলের দল, আসুক সন্ন্যাসীবেশে রাজা। তা হলে কবিকে একবার ডেকে দাওনা, তার সঙ্গে একবার কথা কয়ে নিই।

মন্ত্রী। তাঁকে ডাক্‌ব কি মহারাজ, তিনি নিজেই যে এই পালায় সাজ্‌চেন।

রাজা। বল কি, তাঁর শিক্ষা হল কোথায়?

মন্ত্রী। তার শিক্ষা হয়ই নি।

রাজা। তবে? সে কি হাত পা নেড়ে গলা ছেড়ে দিয়ে আসর জমাতে পারবে? সে যে আনাড়ি।

মন্ত্রী। পাছে যারা হাত পা নাড়তে শিক্ষা পেয়েচে তাদের ডাকা হয় এই ভয়েই সে নিজেই সন্ন্যাসী সাজবার ভার নিয়েছে। সে বলে, পালার বিষয়টা যেমন অনর্থক পালার নটের দলও তেমনি অশিক্ষিত।

রাজা। তা এ নিয়ে এখন পরিতাপ ক'রে কোন লাভ নেই। তা হলে আরম্ভ করে দাও। একটা সুবিধে এই যে বেশী কিছু আশা করব না সুতরাং বেশী কিছু নৈরাশ্যের আশঙ্কা থাকবে না। গোড়ায় একটা গান হবে তো?

মন্ত্রী। হবে বৈ কি। এই যে গানের দল আপনার পাশেই ব'সে।

শারদোৎসব

আজ বুকের বসন ছিঁড়ে ফেলে
দাঁড়িয়েছে এই প্রভাতখানি,
আকাশেতে সোনার আলোয়
ছড়িয়ে গেল তাহার বাণী ॥
ওরে মন, খুলে দে মন,
যা আছে তোর খুলে দে।
অন্তরে যা ডুবে আছে
আলোক পানে তুলে দে।
আনন্দে সব বাধা টুটে
সবার সাথে ওঠ রে ফুটে,
চোখের পরে আলস ভরে
রাখিস্‌নে আর আঁচল টেনে ॥

পাত্রগণ

সন্ন্যাসী	রাজা
ঠাকুরদাদা	রাজদূত
লক্ষেশ্বর	অমাত্য
উপনন্দ	বালকগণ

প্রথম দৃশ্য

পথে বালকগণ

গান

মেঘের কোলে রোদ হেসেছে
বাদল গেছে টুটি,
আজ আমাদের ছুটি, ও ভাই,
আজ আমাদের ছুটি ॥
কী করি আজ ভেবে না পাই,
পথ হারিয়ে কোন্ বনে যাই,
কোন্ মাঠে যে ছুটে বেড়াই,
সকল ছেলে জুটি ॥
কেয়া পাতায় নৌকো গ'ড়ে
সাজিয়ে দেব ফুলে,
তাল দীঘিতে ভাসিয়ে দেব,
চল্‌বে দুলে দুলে।
রাখাল ছেলের সঙ্গে ধেনু
চরাব আজ বাজিয়ে বেণু,
মাখ্‌ব গায়ে ফুলের রেণু
চাঁপার বনে লুটি।
আজ আমাদের ছুটি, ও ভাই,
আজ আমাদের ছুটি ॥

লক্ষেশ্বর

(ঘর হইতে ছুটিয়া বাহির হইয়া)

ছেলেগুলো তো জ্বালালে! ওরে চোবে, ওরে গিরধারীলাল, ধর্ তো ছোঁড়াগুলোকে ধর্ তো।

ছেলেরা

(দূরে ছুটিয়া গিয়া হাততালি দিয়া)

ওরে লক্ষ্মীপেঁচা বেরিয়েছে রে, লক্ষ্মীপেঁচা বেরিয়েছে।

লক্ষেশ্বর

হনুমন্ত সিং, ওদের কান পাক্‌ড়ে আন্ তো ; একটাকেও ছাড়িস্‌নে।

একজন বালক

(চুপি চুপি পশ্চাৎ হইতে আসিয়া কান হইতে কলম টানিয়া লইয়া)

কাক লেগেছে লক্ষ্মীপেঁচা,
লেজে ঠোকর খেয়ে চেঁচা।

লক্ষেশ্বর

হতভাগা, লক্ষ্মীছাড়া সব, আজ একটাকেও আস্ত রাখ্‌বনা।

(ঠাকুরদাদার প্রবেশ)

ঠাকুরদাদা

কী হয়েছে লখা দাদা? মার-মূর্ত্তি কেন?

লক্ষেশ্বর

আরে দেখনা! সকাল বেলা কানের কাছে চেঁচাতে আরম্ভ করেছে।

ঠাকুরদাদা

আজ যে শরতে ওদের ছুটি, একটু আমোদ করবে না? গান গাইলেও

তোমার কানে খোঁচা মারে। হায়রে হায়, ভগবান তোমাকে এত শাস্তিও দিচ্ছেন !

লক্ষেশ্বর

গান গা'বার বুঝি সময় নেই ! আমার হিসাব লিখতে ভুল হয়ে যায় যে আজ আমার সমস্ত দিনটাই মাটি করলে ।

ঠাকুরদাদা

তা ঠিক, হিসেব ভুলিয়ে দেবার ওস্তাদ ওরা। ওদের সাড়া পেলে আমার বয়সের হিসাবে প্রায় পঞ্চাশ পঞ্চান্ন বছরের গরমিল হয়ে যায়। ওরে বাঁদরগুলো, আয় তো রে, চল্ ; তোদের পঞ্চাননতলার মাঠটা ঘুরিয়ে আনি। যাও দাদা, তোমার দপ্তর নিয়ে বস গে, আর হিসেবে ভুল হবে না।

(ছেলেরা ঠাকুরদাদাকে ঘিরিয়া নৃত্য)

প্রথম

হাঁ ঠাকুরদাদা চলো।

দ্বিতীয়

আমাদের আজ গল্প বল্‌তে হবে।

তৃতীয়

না, গল্প না ; বটতলায় ব'সে আজ ঠাকুর্দ্দার পাঁচালি হবে।

চতুর্থ

বটতলায় না, ঠাকুর্দ্দা আজ পারুলডাঙায় চলো।

ঠাকুরদাদা

চুপ, চুপ্, চুপ ; অমন গোলমাল লাগাস্ যদি তো লখাদাদা আবার ছুটে আস্‌বে।

(লক্ষেশ্বরের পুনঃপ্রবেশ)

লক্ষেশ্বর

কোন্ পোড়ারমুখো আমার কলম নিয়েছে রে ?

(কলম ফেলিয়া দিয়া সকলের প্রস্থান)

(উপনন্দের প্রবেশ)

লক্ষেশ্বর

কী রে তোর প্রভু কিছু টাকা পাঠিয়ে দিলে ? অনেক পাওনা বাকি।

উপনন্দ

কাল রাত্রে আমার প্রভুর মৃত্যু হয়েছে।

লক্ষেশ্বর

মৃত্যু, মৃত্যু হলে চল্‌বে কেন ? আমার টাকাগুলোর কী হবে ?

উপনন্দ

তাঁর তো কিছুই নেই। যে বীণা বাজিয়ে উপার্জ্জন ক'রে তোমার ঋণ শোধ করতেন সেই বীণাটি আছে মাত্র।

লক্ষেশ্বর

বীণাটি আছে মাত্র ! কী শুভ সংবাদটাই দিলে।

উপনন্দ

আমি শুভ সংবাদ দিতে আসিনি। আমি একদিন পথের ভিক্ষুক ছিলেম, তিনিই আমাকে আশ্রয় দিয়ে তাঁর বহুদুঃখের অন্নের ভাগে আমাকে মানুষ করেছেন। তোমার কাছে দাসত্ব ক'রে আমি সেই মহাত্মার ঋণ শোধ করব।

লক্ষেশ্বর

বটে ! তাই বুঝি তাঁর অভাবে আমার বহুদুঃখের অন্নে ভাগ বসাবার

মৎলব করেছ ? আমি তত বড় গর্দ্দভ নই। আচ্ছা, তুই কী করতে পারিস্ বল্ দেখি।

উপনন্দ

আমি চিত্রবিচিত্র ক'রে পুঁথি নকল করতে পারি। তোমার অন্ন আমি চাইনে। আমি নিজে উপার্জ্জন ক'রে যা পারি খাব—তোমার ঋণও শোধ করব।

লক্ষেশ্বর

আমাদের বীণকারটিও যেমন নির্ব্বোধ ছিল ছেলেটাকেও দেখচি ঠিক তেমনি করেই বানিয়ে গেছে। হতভাগা ছোঁড়াটা পরের দায় ঘাড়ে নিয়েই মরবে। এক একজনের ঐ রকম মরাই স্বভাব।—আচ্ছা বেশ, মাসের ঠিক তিন তারিখের মধ্যেই নিয়মমত টাকা দিতে হবে। নইলে—

উপনন্দ

নইলে আবার কি ! আমাকে ভয় দেখাচ্চ মিছে। আমার কী আছে যে তুমি আমার কিছু করবে ? আমি আমার প্রভুকে স্মরণ ক'রে ইচ্ছা ক'রেই তোমার কাছে বন্ধন স্বীকার করেছি। আমাকে ভয় দেখিয়ো না বল্‌চি !

লক্ষেশ্বর

না না ভয় দেখাব না। তুমি লক্ষ্মীছেলে, সোনার চাঁদ ছেলে। টাকাটা ঠিক মতো দিয়ো বাবা, নইলে আমার ঘরে দেবতা আছে তার ভোগ কমিয়ে দিতে হবে—সেটাতে তোমারই পাপ হবে।

(উপনন্দের প্রস্থান)

ঐ যে, আমার ছেলেটা এখানে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমি কোন্‌খানে টাকা পুঁতে রাখি ও নিশ্চয়ই সেই খোঁজে ফেরে। ওদেরই ভয়েই তো আমাকে এক সুরঙ্গ হ'তে আর এক সুরঙ্গে টাকা বদল ক'রে বেড়াতে হয়। ধনপতি, এখানে কেন রে ! তোর মৎলবটা কী বল্ দেখি !

ধনপতি

ছেলেরা আজ সকলেই বেতসিনীর ধারে আমোদ করতে গেছে—আমাকে ছুটি দিলে আমিও যাই।

লক্ষেশ্বর

বেতসিনীর ধারে; ঐ রে, খবর পেয়েছে বুঝি! বেতসিনীর ধারেই তো আমি সেই গজমোতির কৌটো পুঁতে রেখেছি। (ধনপতির প্রতি) না, না, খবরদার বলছি, সে সব না। চল্ শীঘ্র চল্, নামতা মুখস্থ করতে হবে।

ধনপতি

(*নিঃশ্বাস ফেলিয়া*) আজ এমন সুন্দর দিনটা।

লক্ষেশ্বর

দিন আবার সুন্দর কি রে? এই রকম বুদ্ধি মাথায় ঢুকলেই ছোঁড়াটা মরবে আর কি! যা বল্‌ছি ঘরে যা! (ধনপতির প্রস্থান) ভারি বিশ্রী দিন; আশ্বিনের এই রোদ্দুর দেখ্‌লে আমার সুদ্ধ মাথা খারাপ ক'রে দেয়, কিছুতে কাজে মন দিতে পারিনে। মনে করছি মলয়দ্বীপে গিয়ে কিছু চন্দন জোগাড় করবার জন্যে বেরিয়ে পড়লে হয়। যাই হোক্, সে পরে হবে, আপাতত বেতসিনীর ধারটায় একবার ঘুরে আস্‌তে হচ্চে। ছোঁড়াগুলো খবর পায়নি তো! ওদের যে ইঁদুরের স্বভাব, সব জিনিষ খুঁড়ে বের করে ফেলে—কোন জিনিষের মূল্য বোঝে না, কেবল কেটেকুটে ছারখার করতেই ভালোবাসে।

দ্বিতীয় দৃশ্য

বেতসিনীর তীর—বন

ঠাকুরদাদা ও বালকগণ

গান

আজ ধানের ক্ষেতে রৌদ্রছায়ায়
লুকোচুরি খেলা।
নীল আকাশে কে ভাসালে
শাদা মেঘের ভেলা॥

একজন বালক

ঠাকুর্দ্দা তুমি আমাদের দলে।

দ্বিতীয় বালক

না ঠাকুর্দ্দা, সে হবে না, তুমি আমাদের দলে।

ঠাকুরদাদা

না ভাই আমি ভাগাভাগির খেলায় নেই; সে সব হয়ে বয়ে গেছে। আমি সকল দলের মাঝখানে থাক্‌ব, কাউকে বাদ দিতে পারব না। এবার গানটা ধর!

গান।

আজ ভ্রমর ভোলে মধু খেতে
উড়ে বেড়ায় আলোয় মেতে,
আজ কিসের তরে নদীর চরে
চখাচখির মেলা॥

অন্য দল আসিয়া

ঠাকুর্দ্দা, এই বুঝি? আমাদের তুমি ডেকে আন্‌লে না কেন? তোমার সঙ্গে আড়ি, জন্মের মত আড়ি!

ঠাকুরদাদা

এত বড় দণ্ড! নিজেরা দোষ ক'রে আমাকে শাস্তি! আমি তোদের ডেকে বের করব, না, তোরা আমাকে ডেকে বাইরে টেনে আন্‌বি! না ভাই, আজ ঝগড়া না, গান ধর।

গান

ওরে যাব না, আজ ঘরে রে ভাই
যাব না আজ ঘরে।
ওরে আকাশ ভেঙে বাহিরকে আজ
নেব রে লুঠ ক'রে॥
যেন জোয়ার জলে ফেনার রাশি
বাতাসে আজ ছুট্‌ছে হাসি,
আজ বিনা কাজে বাজিয়ে বাঁশি
কাট্‌বে সকল বেলা॥

প্রথম বালক

ঠাকুর্দ্দা, ঐ দেখ, ঐ দেখ সন্ন্যাসী আস্‌ছে।

দ্বিতীয় বালক

বেশ হয়েছে, বেশ হয়েছে, আমরা সন্ন্যাসীকে নিয়ে খেল্‌ব! আমরা সব চেলা সাজ্‌ব।

তৃতীয় বালক

আমরা ওঁর সঙ্গে বেরিয়ে যাব, কোন্ দেশে চলে যাব কেউ খুঁজেও পাবে না।

ঠাকুরদাদা

আরে চুপ্, চুপ্ !

সকলে

সন্ন্যাসী ঠাকুর, সন্ন্যাসী ঠাকুর।

ঠাকুরদাদা

আরে থাম্ থাম্ ! ঠাকুর রাগ করবে।

(সন্ন্যাসীর প্রবেশ)

বালকগণ

সন্ন্যাসী ঠাকুর, তুমি কি আমাদের উপর রাগ করবে ? আজ আমরা সব তোমার চেলা হব।

সন্ন্যাসী

হা হা হা হা ! এ তো খুব ভাল কথা। তারপরে আবার তোমরা সব শিশু-সন্ন্যাসী সেজো, আমি তোমাদের বুড়ো চেলা সাজ্‌ব। এ বেশ খেলা, চমৎকার খেলা।

ঠাকুরদাদা

প্রণাম হই। আপনি কে ?

সন্ন্যাসী

আমি ছাত্র।

ঠাকুরদাদা

আপনি ছাত্র ?

সন্ন্যাসী

হাঁ, পুঁথিপত্র সব পোড়াবার জন্যে বের হয়েছি।

ঠাকুরদাদা

ও ঠাকুর বুঝেছি! বিদ্যের বোঝা সমস্ত ঝেড়ে ফেলে দিব্যি একেবারে হাল্কা হয়ে সমুদ্রে পাড়ি দেবেন।

সন্ন্যাসী

চোখের পাতার উপরে পুঁথির পাতাগুলো আড়াল ক'রে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়েছে—সেইগুলো খসিয়ে ফেল্‌তে চাই।

ঠাকুরদাদা

বেশ, বেশ, আমাকেও একটু পায়ের ধূলো দেবেন। প্রভু, আপনার নাম বোধ করি শুনেছি—আপনি তো স্বামী অপূর্ব্বানন্দ?

ছেলেরা

সন্ন্যাসী ঠাকুর, ঠাকুরদাদা কী মিথ্যে বক্‌চেন! এমনি ক'রে আমাদের ছুটি বয়ে যাবে।

সন্ন্যাসী

ঠিক বলেছ, বৎস, আমারও ছুটি ফুরিয়ে আস্‌ছে।

ছেলেরা

তোমার কতদিনের ছুটি?

সন্ন্যাসী

খুব অল্পদিনের। আমার গুরুমশায় তাড়া ক'রে বেরিয়েছেন, তিনি বেশী দূরে নেই, এলেন বলে।

ছেলেরা

ও বাবা, তোমারো গুরুমশায়?

প্রথম বালক

সন্ন্যাসী ঠাকুর, চলো, আমাদের যেখানে হয় নিয়ে চলো। তোমার যেখানে খুসী।

ঠাকুরদাদা

আমিও পিছনে আছি, ঠাকুর, আমাকেও ভুলো না।

সন্ন্যাসী

আহা, ও ছেলেটি কে? গাছের তলায় এমন দিনে পুঁথির মধ্যে ডুবে রয়েছে।

বালকগণ

উপনন্দ।

প্রথম বালক

ভাই উপনন্দ, এসো, ভাই, আমরা আজ সন্ন্যাসী ঠাকুরের চেলা সেজেছি, তুমিও চলো আমাদের সঙ্গে। তুমি হবে সর্দ্দার চেলা।

উপনন্দ

না ভাই, আমার কাজ আছে।

ছেলেরা

কিচ্ছু কাজ নেই, তুমি এসো।

উপনন্দ

আমার পুঁথি নকল কর্‌তে অনেকখানি বাকি আছে।

ছেলেরা

সে বুঝি কাজ, ভারি তো কাজ। ঠাকুর, তুমি ওকে বলো না। ও আমাদের কথা শুন্‌বে না। কিন্তু উপনন্দকে না হ'লে মজা হবে না।

সন্ন্যাসী

(পাশে বসিয়া)

বাছা, তুমি কী কাজ কর্‌ছো? আজ তো কাজের দিন না।

উপনন্দ

(সন্ন্যাসীর মুখের দিকে ক্ষণকাল চাহিয়া, পায়ের ধূলা লইয়া)

আজ ছুটির দিন—কিন্তু আমার ঋণ আছে, শোধ কর্‌তে হবে তাই আজ কাজ কর্‌ছি।

ঠাকুরদাদা

উপনন্দ, জগতে তোমার আবার ঋণ কিসের ভাই ?

উপনন্দ

ঠাকুরদাদা, আমার প্রভু মারা গিয়েছেন ; তিনি লক্ষেশ্বরের কাছে ঋণী ; সেই ঋণ আমি পুঁথি লিখে শোধ দেবো।

ঠাকুরদাদা

হায়, হায়, তোমার মত কাঁচা বয়সের ছেলেকেও ঋণ শোধ কর্‌তে হয়, আর এমন দিনেও ঋণশোধ ? ঠাকুর, আজ নতুন উত্তরে হাওয়ায় ওপারে কাশের বনে ঢেউ দিয়েছে, এপারে ধানের ক্ষেতের সবুজে চোখ একেবারে ডুবিয়ে দিলে, শিউলি বন থেকে আকাশে আজ পূজোর গন্ধ ভ'রে উঠেছে, এরি মাঝখানে ঐ ছেলেটি আজ ঋণশোধের আয়োজনে ব'সে গেছে, এও কি চক্ষে দেখা যায় ?

সন্ন্যাসী

বল কী, এর চেয়ে সুন্দর কি আর কিছু আছে ? ঐ ছেলেটিই তো আজ সারদার বরপুত্র হ'য়ে তাঁর কোল উজ্জ্বল ক'রে বসেছে। তিনি তাঁর আকাশের সমস্ত সোনার আলো দিয়ে ওকে বুকে চেপে ধরেছেন। আহা, আজ এই বালকের ঋণশোধের মতো এমন শুভ্র ফুলটি কি কোথাও ফুটেছে, চেয়ে দেখ তো। লেখ, লেখ, বাবা, তুমি লেখ, আমি দেখি। তুমি পংক্তির পর পংক্তি লিখ্‌ছ, আর ছুটির পর ছুটি পাচ্ছো,—তোমার এত ছুটির আয়োজন

আমরা তো পণ্ড করতে পার্‌বো না। দাও বাবা, একটা পুঁথি আমাকে দাও, আমিও লিখি। এমন দিনটা সার্থক হোক্।

ঠাকুরদাদা

আছে, আছে, চসমাটা ট্যাঁকে আছে, আমিও ব'সে যাই না।

প্রথম বালক

ঠাকুর, আমরাও লিখ্‌বো। সে বেশ মজা হবে।

দ্বিতীয় বালক

হাঁ, হাঁ, সে বেশ মজা হবে।

উপনন্দ

বল কী, ঠাকুর, তোমাদের যে ভারি কষ্ট হবে।

সন্ন্যাসী।

সেই জন্তেই ব'সে গেছি। আজ আমরা সব মজা ক'রে কষ্ট কর্‌বো! কী বলো, বাবাসকল! আজ একটা কিছু কষ্ট না করলে আনন্দ হচ্ছে না।

সকলে

(হাততালি দিয়া)

হাঁ, হাঁ, নইলে মজা কিসের।

প্রথম বালক

দাও, দাও, আমাকে একটা পুঁথি দাও।

দ্বিতীয় বালক

আমাকে একটা দাও না।

উপনন্দ

তোমরা পার্‌বে তো ভাই ?

প্রথম বালক

খুব পার্‌বো। কেন পার্‌বো না।

উপনন্দ

শ্রান্ত হবে না তো ?

দ্বিতীয় বালক

কখ্‌খনো না।

উপনন্দ

খুব ধ'রে ধ'রে লিখ্‌তে হবে কিন্তু।

প্রথম বালক

তা বুঝি পারিনে ? আচ্ছা তুমি দেখ।

উপনন্দ

ভুল থাক্‌লে চল্‌বে না।

দ্বিতীয় বালক

কিচ্ছু ভুল থাক্‌বে না।

প্রথম বালক

এ বেশ মজা হচ্ছে। পুঁথি শেষ করবো তবে ছাড়্‌বো।

দ্বিতীয় বালক

নইলে ওঠা হবে না।

তৃতীয় বালক

কী বলো ঠাকুর্দ্দা, আজ লেখা শেষ ক'রে দিয়ে তবে উপনন্দকে নিয়ে নৌকো বাচ কর্‌তে যাবো। বেশ মজা।

ঠাকুরদাদার গান

সিন্ধু ভৈরবী—তেওরা

আনন্দেরি সাগর থেকে এসেছে আজ বাণ।
দাঁড় ধ'রে আজ ব'স্‌ রে সবাই, টান্‌ রে সবাই টান্‌।
বোঝা যত বোঝাই করি
কর্‌বো রে পার দুখের তরী,

ঢেউয়ের পরে ধর্‌বো পাড়ি
যায় যদি যাক্ প্রাণ।
কে ডাকে রে পিছন হ'তে, কে করে রে মানা ?
ভয়ের কথা কে বলে আজ ভয় আছে সব জানা।
কোন্ পাপে কোন্ গ্রহের দোষে
সুখের ডাঙায় থাক্‌বো ব'সে ?
পালের রসি ধর্‌বো কসি'
চল্‌বো গেয়ে গান।

সন্ন্যাসী

ঠাকুর্দ্দা,

ঠাকুরদাদা

(জিভ কাটিয়া)

প্রভু, তুমিও আমাকে পরিহাস করবে ?

সন্ন্যাসী

তুমি যে জগতে ঠাকুর্দ্দা হয়েই জন্মগ্রহণ করেছো। ঈশ্বর সকলের সঙ্গেই তোমার হাসির সম্বন্ধ পাতিয়ে দিয়ে বসেছেন, সে তো তুমি লুকিয়ে রাখ্‌তে পার্‌বে না। ছোট ছোট ছেলেগুলির কাছেও ধরা পড়েছো, আর আমাকেই ফাঁকি দেবে ?

ঠাকুরদাদা

ছেলে ভোলানোই যে আমার কাজ—তা ঠাকুর, তুমিও যদি ছেলের দলেই ভিড়ে যাও তা হলে কথা নেই। তা কী আজ্ঞা করো ?

সন্ন্যাসী

আমি বল্‌ছিলেম ঐ যে-গানটা গাইলে ওটা আজ ঠিক হ'লো না। দুঃখ নিয়ে ঐ অত্যন্ত টানাটানির কথাটা ওটা আমার কানে ঠিক লাগ্‌ছে না। দুঃখ তো জগৎ ছেয়েই আছে কিন্তু চারদিকে চেয়ে দেখ'না টানাটানির ত কোনো চেহারা দেখা যায় না। তাই এই শরৎ-প্রভাতের মান রাখবার জন্যে আমাকে আর একটা গান গাইতে হ'লো।

ঠাকুরদাদা

তোমাদের সঙ্গ এই জন্যই এত দামী—ভুল করলেও ভুলকে সার্থক ক'রে তোলো।

সন্ন্যাসী

গান

ললিত—আড়াঠেকা

তোমার সোনার থালায় সাজাবো আজ
দুখের অশ্রুধার।
জননী গো, গাঁথ্‌বো তোমার
গলার মুক্তাহার।
চন্দ্রসূর্য্য পায়ের কাছে
মালা হ'য়ে জড়িয়ে আছে,
তোমার বুকে শোভা পাবে আমার
দুখের অলঙ্কার।
ধন ধান্য তোমারি ধন,
কী করবে তা কও।

দিতে চাও তো দিয়ো আমায়
নিতে চাও তো লও।
দুঃখ আমার ঘরের জিনিষ,
খাঁটি রতন তুই তো চিনিস্,
তোর প্রসাদ দিয়ে তারে কিনিস্
এ মোর অহঙ্কার।

বাবা উপনন্দ, তোমার প্রভুর কী নাম ছিল?

উপনন্দ

স্বরসেন।

সন্ন্যাসী

স্বরসেন? বীণাচার্য্য?

উপনন্দ

হাঁ ঠাকুর, তুমি তাঁকে জান্‌তে?

সন্ন্যাসী

আমি তাঁর বীণা শুন্‌বো আশা ক'রেই এখানে এসেছিলেম।

উপনন্দ

তাঁর কি এত খ্যাতি ছিল?

ঠাকুরদাদা

তিনি কি এত বড় গুণী? তুমি তাঁর বাজনা শোনবার জন্যেই এ দেশে এসেছো? তবে তো আমরা তাঁকে চিনি নি?

সন্ন্যাসী

এখানকার রাজা?

ঠাকুরদাদা

এখানকার রাজা তো কোনোদিন তাঁকে ডাকেন নি, চক্ষেও দেখেন নি। তুমি তার বীণা কোথায় শুন্‌লে ?

সন্ন্যাসী

তোমরা হয় তো জান না বিজয়াদিত্য ব'লে একজন রাজা—

ঠাকুরদাদা

বল' কি ঠাকুর ! আমরা অত্যন্ত মূর্খ, গ্রাম্য, তাই ব'লে বিজয়াদিত্যের নাম জানব না এও কি হয় ? তিনি যে আমাদের চক্রবর্ত্তী সম্রাট্‌।

সন্ন্যাসী

তা হবে। তা সেই লোকটির সভায় একদিন স্বরসেন বীণা বাজিয়েছিলেন, তখন শুনেছিলেম। রাজা তাঁকে রাজধানীতে রাখ্‌বার জন্যে অনেক চেষ্টা ক'রেও কিছুতেই পারেন নি।

ঠাকুরদাদা

হায় হায়, এত বড় লোকের আমরা কোনো আদর করতে পারি

সন্ন্যাসী

আদর করোনি—তাতে তাঁকে কমাতে পারোনি, আরো তাঁকে বড় করেছো। ভগবান তাঁকে নিজের সভায় ডেকে নিয়েছেন। বাবা উপনন্দ, তোমার সঙ্গে তাঁর কী রকমে সম্বন্ধ হ'লো ?

উপনন্দ

ছোট বয়সে আমার বাপ মারা গেলে আমি অন্য দেশ থেকে এই নগরে আশ্রয়ের জন্যে এসেছিলেম। সেদিন শ্রাবণমাসের সকাল বেলায় আকাশ ভেঙে বৃষ্টি পড়ছিলো, আমি লোকনাথের মন্দিরের এককোণে দাঁড়াবো ব'লে প্রবেশ কর্‌ছিলেম। পুরোহিত আমাকে বোধ হয় নীচ জাত মনে ক'রে

তাড়িয়ে দিলেন। সেদিন সকালে সেইখানে ব'সে আমার প্রভু বীণা বাজাচ্ছিলেন। তিনি তখনি মন্দির ছেড়ে এসে আমার গলা জড়িয়ে ধরলেন—বল্লেন, এসো বাবা, আমার ঘরে এসো। সেই দিন থেকে ছেলের মতো তিনি আমাকে কাছে রেখে মানুষ করেছেন—লোকে তাঁকে কত কথা বলেছে, তিনি কান দেননি। আমি তাঁকে বলেছিলেম, প্রভু, আমাকে বীণা বাজাতে শেখান, আমি তা হলে কিছু কিছু উপার্জ্জন ক'রে আপনার হাতে দিতে পার্‌বো। তিনি বল্লেন, বাবা, এ বিদ্যা পেট ভরাবার নয়; আমার আর এক বিদ্যা জানা আছে তাই তোমাকে শিখিয়ে দিচ্ছি। এই ব'লে আমাকে রং দিয়ে চিত্র ক'রে পুঁথি লিখ্‌তে শিখিয়েছেন। যখন অত্যন্ত অচল হয়ে উঠ্‌তো তখন তিনি মাঝে মাঝে বিদেশে গিয়ে বীণা বাজিয়ে টাকা নিয়ে আস্‌তেন। এখানে তাঁকে সকলে পাগল ব'লেই জান্‌তো।

সন্ন্যাসী

স্বরসেনের বীণা শুন্‌তে পেলেম না, কিন্তু বাবা উপনন্দ, তোমার কল্যাণে তাঁর আর এক বীণা শুনে নিলুম, এর স্বর কোনোদিন ভুলবো না। বাবা, লেখ, লেখ!

ছেলেরা

ঐরে ঐ আস্‌ছে! ঐরে লখা, ঐরে লক্ষ্মীপেঁচা!

(দৌড়)

লক্ষেশ্বর

আ সর্ব্বনাশ! যেখানটিতে আমি কৌটো পুঁতে রেখেছিলুম ঠিক সেই জায়গাটিতেই যে উপনন্দ ব'সে গেছে! আমি ভেবেছিলেম ছোঁড়াটা বোকা বুঝি, তাই পরের ঋণ শুধতে এসেছে। তা তো নয় দেখ্‌ছি! পরের ঘাড় ভাঙাই ওর ব্যবসা। আমার গজমোতির খবর পেয়েছে। একটা সন্ন্যাসীকেও

কোথা থেকে জুটিয়ে এনেছে দেখছি! সন্ন্যাসী হাত চেলে জায়গাটা বের ক'রে দেবে। উপনন্দ—

উপনন্দ

কি?

লক্ষেশ্বর

ওঠ ওঠ্ ঐ জায়গা থেকে। এখানে কী করতে এসেছিস্?

উপনন্দ

অমন ক'রে চোখ রাঙাও কেন? এ কি তোমার জায়গা না কি?

লক্ষেশ্বর

এটা আমার জায়গা কি না সে খোঁজে তোমার দরকার কিহে বাপু! ভারি সেয়ানা দেখ্‌ছি। তুমি বড় ভালমানুষটি সেজে আমার কাছে এসেছিলে। আমি বলি সত্যিই বুঝি প্রভুর ঋণ শোধ করবার জন্যেই ছোঁড়াটা আমার কাছে এসেছে—কেননা, সেটা রাজার আইনেও আছে—

উপনন্দ

আমি তো সেই জন্যেই এখানে পুঁথি লিখ্‌তে এসেছি।

লক্ষেশ্বর

সেই জন্যেই এসেছো বটে! আমার বয়স কত আন্দাজ কর্‌ছো বাপু! আমি কি শিশু?

সন্ন্যাসী

কেন বাবা, তুমি কী সন্দেহ কর্‌ছো?

লক্ষেশ্বর

কী সন্দেহ কর্‌ছি। তুমি তা কিছু জান না! বড় সাধু! ভণ্ড সন্ন্যাসী কোথাকার।

ঠাকুরদাদা

আরে কী বলিস্ লখা? আমার ঠাকুরকে অপমান?

উপনন্দ

এই রং-বাঁটা নোড়া দিয়ে তোমার মুখ গুঁড়িয়ে দেবো না? টাকা হয়েছে ব'লে অহঙ্কার? কাকে কী বল্‌তে হয় জানো না!

(সন্ন্যাসীর পশ্চাতে লক্ষেশ্বরের লুক্কায়ন)

সন্ন্যাসী

আরে করো কী ঠাকুরদাদা, করো কী বাবা! লক্ষেশ্বর তোমাদের চেয়ে ঢের বেশী মানুষ চেনে! যেম্‌নি দেখেছে অম্‌নি ধরা পড়ে গেছি। ভণ্ড সন্ন্যাসী যাকে বলে! বাবা লক্ষেশ্বর, এত দেশের এত মানুষ ভুলিয়ে এলেম, তোমাকে ভোলাতে পারলেম না।

লক্ষেশ্বর

না, ঠিক ঠাওরাতে পাচ্ছিনে। হয় তো ভা- করিনি। আবার শাপ দেবে, কি, কী করবে! তিনখানা জাহাজ এখনো সমুদ্রে আছে। (পায়ের ধূলা লইয়া) প্রণাম হই ঠাকুর,—হঠাৎ চিন্‌তে পারিনি। বিরূপাক্ষের মন্দিরে আমাদের ঐ বিকটানন্দ ব'লে একটা সন্ন্যাসী আছে, আমি বলি সেই ভণ্ডটাই বুঝি! ঠাকুর্দ্দা, তুমি এক কাজ করো, সন্ন্যাসী ঠাকুরকে আমার ঘরে নিয়ে যাও, আমি ওঁকে কিছু ভিক্ষে দিয়ে দেবো। আমি চল্লেম বলে। তোমরা এগোও।

ঠাকুরদাদা

তোমার বড় দয়া! তোমার ঘরের এক মুঠো চাল নেবার জন্যে ঠাকুর সাত সিন্ধু পেরিয়ে এসেছেন!

সন্ন্যাসী

বলো কি ঠাকুর্দ্দা! এক মুঠো চাল যেখানে দুর্লভ, সেখান থেকে সেটি নিতে হবে বৈ কি! বাবা লক্ষেশ্বর, চলো তোমার ঘরে।

লক্ষেশ্বর

আমি পরে যাচ্ছি, তোমরা এগোও। উপনন্দ, তুমি আগে ওঠো। ওঠো, শীঘ্র ওঠো বলছি, তোলো তোমার পুঁথিপত্র।

উপনন্দ

আচ্ছা, তবে উঠ্‌লেম, কিন্তু তোমার সঙ্গে আমার কোনো সম্বন্ধ রইল না।

লক্ষেশ্বর

না থাকলেই যে বাঁচি বাবা। আমার সম্বন্ধে কাজ কি! এত দিন তো আমার বেশ চ'লে যাচ্ছিল।

উপনন্দ

আমি যে ঋণ স্বীকার করেছিলেম, তোমার কাছে এই অপমান সহ্য ক'রেই তার থেকে মুক্তি গ্রহণ করলেম। বাস চুকে গেল! (প্রস্থান)

লক্ষেশ্বর

ওরে! সব ঘোড়সওয়ার আসে কোথা থেকে! রাজা আমার গজমোতির খবর পেলে না কি! এর চেয়ে উপনন্দ যে ছিল ভাল। এখন কী করি। (সন্ন্যাসীকে ধরিয়া) ঠাকুর, তোমার পায়ে ধরি, তুমি ঠিক এইখানটিতে বসো—এই যে এইখানে—আর একটু বাঁ দিকে স'রে এসো—এই হয়েছে। খুব চেপে বসো! রাজাই আসুক আর সম্রাটই আসুক, তুমি কোনোমতেই এখান থেকে উঠো না। তা হ'লে আমি তোমাকে খুসি ক'রে দেবো।

ঠাকুরদাদা

আরে লখা করে কী! হঠাৎ খেপে গেল না কী।

লক্ষেশ্বর

ঠাকুর, আমি তবে একটু আড়ালে যাই। আমাকে দেখ্‌লেই রাজার টাকার কথা মনে প'ড়ে যায়। শত্রুরা লাগিয়েছে আমি সব টাকা পুঁতে রেখেছি—শুনে অবধি রাজা যে কত জায়গায় কূপ খুঁড়তে আরম্ভ করেছেন তার ঠিকানা নেই। জিজ্ঞাসা করলে বলেন প্রজাদের জলদান করছেন। কোন্‌দিন আমার ভিটেবাড়ীর ভিত্‌ কেটে জলদানের হুকুম হবে, সেই ভয়ে রাত্রে ঘুমতে পারিনে।

(প্রস্থান)

(রাজদূতের প্রবেশ)

রাজদূত

সন্ন্যাসী ঠাকুর, প্রণাম হই। আপনিই তো অপূর্ব্বানন্দ ?

সন্ন্যাসী

কেউ কেউ আমাকে তাই বলেই তো জানে।

দূত

আপনার অসামান্য ক্ষমতার কথা চারদিকে রাষ্ট্র হয়ে গেছে। আমাদের মহারাজ সোমপাল আপনার সঙ্গে দেখা করতে ইচ্ছা করেন।

সন্ন্যাসী

যখনি আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করবেন তখনি আমাকে দেখ্‌তে পাবেন।

দূত

আপনি তা হলে যদি একবার—

সন্ন্যাসী

আমি একজনের কাছে প্রতিশ্রুত আছি এইখানেই আমি অচল হয়ে ব'সে থাক্‌বো। অতএব আমার মতো অকিঞ্চন অকর্ম্মণ্যকেও তোমার রাজার যদি বিশেষ প্রয়োজন থাকে, তা হ'লে তাঁকে এইখানেই আস্‌তে হবে।

দূত

রাজোদ্যান অতি নিকটেই—ঐখানেই তিনি অপেক্ষা করছেন।

সন্ন্যাসী

যদি নিকটেই হয় তবে তো তাঁর আস্‌তে কোনো কষ্ট হবে না।

দূত

যে আজ্ঞা, তবে ঠাকুরের ইচ্ছা তাঁকে জানাইগে।

(প্রস্থান)

ঠাকুরদাদা

প্রভু, এখানে রাজসমাগমের সম্ভাবনা হয়ে এল, আমি তবে বিদায় হই।

সন্ন্যাসী

ঠাকুর্দ্দা, তুমি আমার শিশু বন্ধুগুলিকে নিয়ে ততক্ষণ আসর জমিয়ে রাখো, আমি বেশী বিলম্ব করবো না।

ঠাকুরদাদা

রাজার উৎপাতই ঘটুক্ আর অরাজকতাই হোক্, আমি প্রভুর চরণ ছাড়্‌ছিনে।

(প্রস্থান)

(লক্ষেশ্বরের প্রবেশ)

লক্ষেশ্বর

ঠাকুর তুমিই অপূর্ব্বানন্দ ? তবে তো বড় অপরাধ হয়ে গেছে! আমাকে মাপ করতে হবে।

সন্ন্যাসী

তুমি আমাকে ভণ্ডতপস্বী বলেছো, এই যদি তোমার অপরাধ হয় আমি তোমাকে মাপ করলেম।

লক্ষেশ্বর

বাবাঠাকুর, শুধু মাপ করতে তো সকলেই পারে—সে ফাঁকিতে আমার কী হবে? আমাকে একটা কিছু ভাল রকম বর দিতে হচ্চে। যখন দেখা পেয়েছি তখন শুধুহাতে ফিরছিনে।

সন্ন্যাসী

কী বর চাই?

লক্ষেশ্বর

লোকে যতটা মনে করে ততটা নয়, তবে কি না আমার অল্পস্বল্প কিছু জমেছে—সে অতি যৎসামান্য—তাতে আমার মনের আকাঙ্ক্ষা ত মিট্‌ছে না। শরৎকাল এসেছে, আর ঘরে ব'সে থাক্‌তে পারৃছিনে—এখন বাণিজ্যে বেরতে হবে। কোথায় গেলে সুবিধা হ'তে পারে আমাকে সেই সন্ধানটি ব'লে দিতে হবে—আমাকে আর যেন ঘুরে বেড়াতে না হয়।

সন্ন্যাসী

আমিও তো সেই সন্ধানেই আছি।

লক্ষেশ্বর

বলো কী ঠাকুর?

সন্ন্যাসী

আমি সত্যই বলছি।

লক্ষেশ্বর

ওঃ, তবে সেই কথাটাই বলো! বাবা, তোমরা আমাদের চেয়েও সেয়ানা!

সন্ন্যাসী

তার সন্দেহ আছে?

লক্ষেশ্বর

(কাছে ঘেঁসিয়া বসিয়া মৃদুস্বরে)

সন্ধান কিছু পেয়েছো ?

সন্ন্যাসী

কিছু পেয়েছি বই কি। নইলে এমন ক'রে ঘুরে বেড়াবো কেন ?

লক্ষেশ্বর

(সন্ন্যাসীর পা চাপিয়া ধরিয়া)

বাবাঠাকুর, আর একটু খোলসা ক'রে বলো ! তোমার পা ছুঁয়ে বলছি, আমিও তোমাকে একেবারে ফাঁকি দেবো না। কি খুঁজ্‌ছো বলো তো আমি কাউকে বল্‌বো না।

সন্ন্যাসী

তবে শোনো। লক্ষ্মী যে সোনার পদ্মটির উপরে পা দুখানি রাখেন আমি সেই পদ্মটির খোঁজে আছি।

লক্ষেশ্বর

ও বাবা, সে তো কম কথা নয়। তা হলে যে সকল ল্যাঠা চুকে যাকে। ঠাকুর, ভেবে ভেবে এ তো তুমি আচ্ছা বুদ্ধি ঠাওরেছো। কোনোগতিকে পদ্মটি যদি জোগাড় ক'রে আনো, তা হলে লক্ষ্মীকে আর তোমার খুঁজ্‌তে হবে না, লক্ষ্মীই তোমাকে খুঁজে বেড়াবেন ; এ নইলে আমাদের চঞ্চলা ঠাকরুণটিকে তো জব্দ করবার জো নেই। তোমার কাছে তাঁর পা দু'খানিই বাঁধা থাকবে। তা তুমি সন্ন্যাসী মানুষ, একলা পেরে উঠ্‌বে ? এতে তো খরচপত্র আছে। এক কাজ করো না বাবা, আমরা ভাগে ব্যবসা করি।

সন্ন্যাসী

তা হলে তোমাকে যে সন্ন্যাসী হ'তে হবে। বহুকাল সোনা ছুঁতে পাবে না।

লক্ষেশ্বর

সে যে শক্ত কথা।

সন্ন্যাসী

সব ব্যবসা যদি ছাড়্‌তে পারো তবেই এ ব্যবসা চ'ল্‌বে।

লক্ষেশ্বর

শেষকালে দু'কূল যাবে না তো? যদি একেবারে ফাঁকিতে না পড়ি, তা হ'লে তোমার তল্পি ব'য়ে তোমার পিছন পিছন চ'ল্‌তে রাজি আছি। সত্যি বল্‌ছি ঠাকুর, কারো কথায় বড়ো সহজে বিশ্বাস করিনে—কিন্তু তোমার কথাটা কেমন মনে লাগ্‌চে। আচ্ছা। আচ্ছা রাজি। তোমার চেলাই হবো। ঐরে রাজা আস্‌চে, আমি তবে একটু আড়ালে দাঁড়াইগে।

বন্দীগণের গান

মিশ্র কানাড়া—ঝাঁপতাল

রাজ রাজেন্দ্র জয় জয় হে জয় হে।
ব্যাপ্ত পরতাপ তব বিশ্বময় হে
দুষ্টদল-দলন তব দণ্ড ভয়কারী,
শত্রুজন-দর্পহর দীপ্ত তরবারি,
সঙ্কট শরণ্য তুমি দৈন্যদুখ-হারী,
মুক্ত অবরোধ তব অভ্যুদয় হে॥

(রাজার প্রবেশ)

রাজা

প্রণাম হই ঠাকুর।

সন্ন্যাসী

জয় হোক্। কী বাসনা তোমার?

রাজা

সে কথা নিশ্চয় তোমার অগোচর নেই। আমি অখণ্ড রাজ্যের অধীশ্বর হ'তে চাই প্রভু।

সন্ন্যাসী

তা হ'লে গোড়া থেকে সুরু করো। তোমার খণ্ডরাজ্যটি ছেড়ে দাও।

রাজা

পরিহাস নয় ঠাকুর! বিজয়াদিত্যের প্রতাপ আমার অসহ্য বোধ হয়, আমি তা'র সামন্ত হ'য়ে থাক্‌তে পার্‌বো না।

সন্ন্যাসী

রাজন্, তবে সত্য কথা বলি, আমার পক্ষেও সে ব্যক্তি অসহ্য হ'য়ে উঠেছে।

রাজা

বলো কী ঠাকুর!

সন্ন্যাসী

এক বর্ণও মিথ্যা ব'ল্‌ছি নে। তাকে বশ ক'র্‌বার জন্যেই আমি মন্ত্র-সাধনা ক'র্‌ছি।

রাজা

তাই তুমি সন্ন্যাসী হ'য়েছো?

সন্ন্যাসী

তাই বটে!

রাজা

মন্ত্রে সিদ্ধিলাভ হবে?

সন্ন্যাসী

অসম্ভব নেই।

রাজা

তা হ'লে ঠাকুর, আমার কথা মনে রেখো। তুমি যা চাও, আমি তোমাকে দেবো। যদি সে বশ মানে তা হ'লে আমার কাছে যদি—

সন্ন্যাসী

তা বেশ, সেই চক্রবর্ত্তী সম্রাট্‌কে আমি তোমার সভায় ধ'রে আন্‌বো।

রাজা

কিন্তু বিলম্ব ক'র্‌তে ইচ্ছা ক'র্‌চে না। শরৎকাল এসেছে—সকাল বেলা উঠে বেতসিনীর জলের উপর যখন আশ্বিনের রৌদ্র পড়ে তখন আমার সৈন্যসামন্ত নিয়ে দিগ্বিজয়ে বেরিয়ে প'ড়্‌তে ইচ্ছে করে। যদি আশীর্ব্বাদ করো তা হ'লে—

সন্ন্যাসী

কোনো প্রয়োজন নেই; শরৎকালেই আমি তা'কে তোমার কাছে সমর্পণ ক'র্‌বো, এই তো উপযুক্ত কাল। তুমি তাকে নিয়ে কী ক'র্‌বে?

রাজা

আমার একটা কোনো কাজে লাগিয়ে দেবো—তা'র অহঙ্কার দূর ক'র্‌তে হবে।

সন্ন্যাসী

এ তো খুব ভাল কথা! যদি তা'র অহঙ্কার চূর্ণ ক'র্‌তে পারো তা হ'লে ভারি খুসি হবো।

রাজা

ঠাকুর, চলো আমার রাজ-ভবনে।

সন্ন্যাসী

সেটি পার্‌চিনে। আমার দলের লোকদের অপেক্ষায় আছি। তুমি যাও বাবা। আমার জন্যে কিচ্ছু ভেবো না। তোমার মনের বাসনা যে

আমাকে ব্যক্ত ক'রে ব'লেছো এতে আমার ভারি আনন্দ হ'চ্চে। বিজয়াদিত্যের যে এত শত্রু জমে উঠেছে, তা তো আমি জান্‌তেম না।

রাজা

তবে বিদায় হই। প্রণাম।

(প্রস্থান)

(পুনশ্চ ফিরিয়া আসিয়া)

আচ্ছা ঠাকুর, তুমি তো বিজয়াদিত্যকে জানো, সত্য ক'রে বলো দেখি, লোকে তা'র সম্বন্ধে যতটা রটনা করে ততটা কি সত্য?

সন্ন্যাসী

কিছুমাত্র না। লোকে তাকে একটা মস্ত রাজা ব'লে মনে করে, কিন্তু সে নিতান্তই সাধারণ মানুষের মতো। তার সাজ সজ্জা দেখেই লোক ভুলে গেছে।

রাজা

বল কী ঠাকুর, হা হা হা হা! আমিও তাই ঠাউরেছিলেম। অ্যাঁ! নিতান্তই সাধারণ মানুষ!

সন্ন্যাসী

আমার ইচ্ছে আছে আমি তা'কে সেইটে আচ্ছা ক'রে বুঝিয়ে দেবো। সে যে রাজার পোষাক প'রে ফাঁকি দিয়ে অন্য পাঁচ জনের চেয়ে নিজেকে মস্ত একটা কিছু ব'লে মনে করে, আমি তার' সেই ভুলটা একেবারে ঘুচিয়ে দেবো।

রাজা

তাই দিয়ো, ঠাকুর, তাই দিয়ো।

সন্ন্যাসী

তা'র ভণ্ডামী আমার কাছে তো কিছু ঢাকা নেই। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে প্রথম বৃষ্টি হ'লে পর বীজ বোন্‌বার আগে তা'র রাজ্যে একটা মহোৎসব হয়।

সেদিন সব চাষী গৃহস্থরা বনে গিয়ে সীতার পূজা ক'রে সকলে মিলে বনভোজন করে। সেই চাষাদের সঙ্গে একসঙ্গে পাত পেড়ে খাবার জন্যে বিজয়াদিত্যের প্রাণটা কাঁদে। রাজাই হোক্ আর যাই হোক্, ভিতরে যে চাষাটা আছে সেটা যাবে কোথায়? সেবারে তো সে রাজবেশ ছেড়ে ওদের সঙ্গে ব'সে খাবার জন্যে ক্ষেপে উঠেছিলো। কিন্তু ওর মন্ত্রী আর চাকর-বাকরদের মনে রাজাগিরির উচ্চ ভাব ওর চেয়ে অনেক বেশী আছে। তা'রা হাতে পায়ে ধ'রে ব'ল্‌লে, এ কখনোই হ'তে পারে না। অর্থাৎ তা'দের এই ভয়টা আছে যে, ঐ ছদ্মবেশটা খুলে ফেল্‌লেই আসল মানুষটা ধরা প'ড়ে যাবে। এই জন্যে বিজয়াদিত্যকে নিয়ে তা'রা বড়ো ভয়ে ভয়েই থাকে—কোন্' দিন তার সমস্ত ফাঁস হ'য়ে যায়, এই এক বিষম ভাব্‌না!

রাজা

ঠাকুর, তুমি সব ফাঁস ক'রে দাও। ও যে মিথ্যে রাজা, ভুয়ো রাজা, সে যেন আর ছাপা না থাকে। ওর বড়ো অহঙ্কার হ'য়েছে।

সন্ন্যাসী

আমি তো সেই চেষ্টাতেই আছি। তুমি নিশ্চিন্ত থাকো, যতক্ষণ না আমার অভিপ্রায় সিদ্ধ হয়, আমি সহজে ছাড়্‌বো না।

রাজা

প্রণাম। (প্রস্থান)

(উপনন্দের প্রবেশ)

উপনন্দ

ঠাকুর, আমার মনের ভার তো গেলো না!

সন্ন্যাসী

কী হ'লো বাবা?

উপনন্দ

মনে ক'রেছিলেম, লক্ষেশ্বর যখন আমাকে অপমান ক'রেছে তখন ওর কাছে আমি আর ঋণ স্বীকার ক'র্‌বো না। তাই পুঁথিপত্র নিয়ে ঘরে ফিরে গিয়েছিলেম। সেখানে আমার প্রভুর বীণাটি নিয়ে তার ধূলো ঝাড়্‌তে গিয়ে তারগুলি বেজে উঠ্‌লো—অমনি আমার মনটার ভিতর যে কেমন হ'লো সে আমি ব'ল্‌তে পারিনে। সেই বীণার কাছে লুটিয়ে প'ড়ে বুক ফেটে আমার চোখের জল প'ড়্‌তে লাগ্‌লো। মনে হ'লো, আমার প্রভুর কাছে অপরাধ ক'রেছি। লক্ষেশ্বরের কাছে আমার প্রভু ঋণী হ'য়ে রইলেন আর আমি নিশ্চিন্ত হ'য়ে আছি! ঠাকুর, এ তো আমার কোনোমতেই সহ্য হ'চ্চে না! ইচ্ছা ক'র্‌ছে আমার প্রভুর জন্যে আজ আমি অসাধ্য কিছু একটা করি! আমি তোমাকে মিথ্যা বল্‌ছিনে, তাঁর ঋণ শোধ ক'র্‌তে যদি আজ প্রাণ দিতে পারি তা' হ'লে আমার আনন্দ হবে,—মনে হবে, আজকের এই সুন্দর শরতের দিন আমার পক্ষে সার্থক হ'লো।

সন্ন্যাসী

বাবা, তুমি যা ব'ল্‌চো সত্যই ব'ল্‌চো।

উপনন্দ

ঠাকুর, তুমি তো অনেক দেশ ঘুরেছো, আমার মতো অকর্ম্মণ্যকেও হাজার কার্ষাপণ দিয়ে কিন্‌তে পারেন এমন মহাত্মা কেউ আছেন? তা হ'লেই ঋণটা শোধ হ'য়ে যায়। এ নগরে যদি চেষ্টা করি তা হ'লে বালক ব'লে, ছোট জাত ব'লে সকলে আমাকে খুব কম দাম দেবে।

সন্ন্যাসী

না বাবা, তোমার মূল্য এখানে কেউ বুঝ্‌বে না। আমি ভাব্‌চি কি, যিনি তোমার প্রভুকে অত্যন্ত আদর ক'র্‌তেন সেই বিজয়াদিত্য ব'লে রাজাটার কাছে গেলে কেমন হয়?

উপনন্দ

বিজয়াদিত্য ? তিনি যে আমাদের সম্রাট !

সন্ন্যাসী

তাই না কি ?

উপনন্দ

তুমি জানো না বুঝি ?

সন্ন্যাসী

তা হবে। না হয় তাই হ'লো।

উপনন্দ

আমার মতো ছেলেকে তিনি কি দাম দিয়ে কিন্‌বেন ?

সন্ন্যাসী

বাবা, বিনামূল্যে কেন্‌বার মতো ক্ষমতা তাঁর যদি থাকে তা হ'লে বিনা-মূল্যেই কিন্‌বেন। কিন্তু তোমার ঋণটুকু শোধ ক'রে না দিতে পার্‌লে তাঁর এত ঋণ জ'ম্‌বে যে তাঁর রাজভাণ্ডার লজ্জিত হবে, এ আমি তোমাকে সত্যই ব'ল্‌ছি।

উপনন্দ

ঠাকুর, এও কি সম্ভব ?

সন্ন্যাসী

বাবা, জগতে কেবল কি এক লক্ষেশ্বরই সম্ভব, তা'র চেয়ে বড়ো সম্ভাবনা কি আর কিছুই নেই ?

উপনন্দ

আচ্ছা, যদি সম্ভব হয় তো হবে, কিন্তু আমি ততদিন পুঁথিগুলি নকল ক'রে কিছু কিছু শোধ ক'র্‌তে থাকি—নইলে আমার মনে বড় গ্লানি হ'চ্চে।

সন্ন্যাসী

রাজাও না সম্রাট্‌ও না, ঐ মাটিই সব ফাঁকি দিয়ে নেবে। তোমাকেও নেবে, আমাকেও নেবে।

লক্ষেশ্বর

তা নিক্‌গে, কিন্তু আমার কেবলই ভাবনা হয় আমি ম'রে গেলে পর কোথা থেকে কে এসে হঠাৎ হয় তো খুঁড়্‌তে খুঁড়্‌তে ওটা পেয়ে যাবে। যাই হোক্ ঠাকুর, কিন্তু তোমার মুখে ঐ সোনার পদ্মর কথাটা আমার কাছে বড়ো ভালো লাগ্‌লো। আমার কেমন মনে হ'চ্চে ওটা তুমি খুঁজে বের্ ক'র্‌তে পার্‌বে। কিন্তু তা হোক্‌গে, আমি তোমার চেলা হ'তে পার্‌বো না।—প্রণাম।

(প্রস্থান)

(ঠাকুরদাদার প্রবেশ)

সন্ন্যাসী

ঠাকুর্দ্দা, আজ অনেক দিন পরে একটি কথা খুব স্পষ্ট বুঝ্‌তে পেরেছি—সেটি তোমাকে খুলে না ব'লে থাক্‌তে পার্‌চিনে।

ঠাকুরদাদা

আমার প্রতি ঠাকুরের বড়ো দয়া!

সন্ন্যাসী

আমি অনেক দিন ভেবেছি জগৎ এমন আশ্চর্য্য সুন্দর কেন? কিছুই ভেবে পাইনি। আজ স্পষ্ট প্রত্যক্ষ দেখ্‌তে পাচ্চি—জগৎ আনন্দের ঋণ শোধ ক'র্‌ছে! বড় সহজে ক'র্‌চে না, নিজের সমস্ত শক্তি দিয়ে সমস্ত ত্যাগ ক'রে ক'র্‌ছে! সেই জন্যেই ধানের ক্ষেত এমন সবুজ ঐশ্বর্য্যে ভ'রে উঠেছে, বেতসিনীর নির্ম্মল জল এমন কানায় কানায় পরিপূর্ণ। কোথাও সাধনার এতটুকু বিশ্রাম নেই, সেই জন্যেই এত সৌন্দর্য্য।

ঠাকুরদাদা

একদিকে অনন্ত ভাণ্ডার থেকে তিনি কেবলি ঢেলে দিচ্ছেন আর একদিকে কঠিন দুঃখে তারি শোধ চ'ল্‌ছে। সেই দুঃখের আনন্দ এবং সৌন্দর্য্য যে কী সে কথা তোমার কাছে পূর্ব্বেই শুনেছি। প্রভু, কেবল এই দুঃখের জোরেই পাওয়ার সঙ্গে দেওয়ার ওজন বেশ সমান থেকে যাচ্চে, মিলনটি এমন সুন্দর হ'য়ে উঠেছে।

সন্ন্যাসী

ঠাকুর্দ্দা, যেখানে আলস্য, যেখানে কৃপণতা, সেখানেই ঋণ শোধে ঢিল প'ড়ে যাচ্চে, সেইখানেই সমস্ত কুশ্রী, সমস্তই অব্যবস্থ।

ঠাকুরদাদা

সেইখানেই যে একপক্ষে কম প'ড়ে যায়, অন্য পক্ষের সঙ্গে মিলন পূরো হ'তে পায় না।

সন্ন্যাসী

লক্ষ্মী যখন মানবের মর্ত্ত্যলোকে আসেন তখন দুঃখিনী হয়েই আসেন; তাঁর সেই সাধনার তপস্বিনী-বেশেই ভগবান মুগ্ধ হ'য়ে আছেন; শত দুঃখেরই দলে তাঁর সোনার পদ্ম সংসারে ফুঠে উঠেছে, ..া খবরটি আজ ঐ উপনন্দের কাছ থেকে পেয়েছি।

(লক্ষেশ্বরের প্রবেশ)

লক্ষেশ্বর

তোমরা চুপি চুপি দুটিতে কী পরামর্শ কর্‌চো?

সন্ন্যাসী

আমাদের সেই সোনার পদ্মের পরামর্শ।

লক্ষেশ্বর

অ্যাঁ! এরই মধ্যে ঠাকুর্দ্দার কাছে সমস্ত ফাঁস ক'রে ব'সে আছো? বাবা, তুমি এই ব্যবসা-বুদ্ধি নিয়ে সোনার পদ্মর আমদানী ক'র্‌বে? তবেই হ'য়েছে!

তুমি যেই মনে ক'র্‌লে আমি রাজি হ'লেম না অম্‌নি তাড়াতাড়ি অন্য অংশীদার খুঁজতে লেগে গেছো! কিন্তু এসব কি ঠাকুর্দ্দার কর্ম্ম? ওঁর পুঁজিই বা কী?

সন্ন্যাসী

তুমি খবর পাওনি। কিন্তু একেবারে পুঁজি নেই তা নয়! ভিতরে ভিতরে জমিয়েছে!

লক্ষেশ্বর

(ঠাকুরদাদার পিঠ চাপ্‌ড়াইয়া)

সত্যি না কি ঠাকুর্দ্দা? বড়ো তো ফাঁকি দিয়ে আস্‌চো! তোমাকে তো চিন্‌তেম না! লোকে আমাকেই সন্দেহ করে, তোমাকে তো স্বয়ং রাজাও সন্দেহ করে না! তা হ'লে এতদিন খানাতল্লাসী প'ড়ে যেতো। আমার তো, দাদা, গুপ্তচরের ভয়ে ঘরে চাকরবাকর রাখিনে।

ঠাকুরদাদা

তবে যে আজ সকালে ছেলে তাড়াবার বেলায় উর্দ্ধস্বরে চোবে, তেওয়ারী, গির্‌ধারীলালকে হাঁক পাড়্‌ছিলে?

লক্ষেশ্বর

যখন নিশ্চয় জানি হাঁক পাড়্‌লেও কেউ আস্‌বে না, তখন উর্দ্ধস্বরের জোরেই আসর গরম ক'রে তুল্‌তে হয়। কিন্তু ব'লে তো ভালো ক'র্‌লেম না! মানুষের সঙ্গে কথা কবার তো বিপদই ঐ! সেই জন্যেই কারো কাছে ঘেঁসি নে। দেখো দাদা, ফাঁস ক'রে দিয়ো না।

ঠাকুরদাদা

ভয় নেই তোমার।

লক্ষেশ্বর

ভয় না থাকলেও তবু ভয় ঘোচে কই? যা হোক্ ঠাকুর, একা ঠাকুর্দ্দাকে নিয়ে অতো বড়ো কাজটা চ'ল্‌বে না। আমরা না হয় তিন জনেই অংশীদার

হবো। ঠাকুর্দ্দা আমাকে ফাঁকি দিয়ে জিতে নেবে সেটি হ'চ্চে না। আচ্ছা ঠাকুর, তবে আমিও তোমার চেলা হ'তে রাজি হ'লেম। ঐ যে ঝাঁকে ঝাঁকে মানুষ আস্‌চে। ঐ দেখ্‌চো না দূরে—আকাশে যে ধূলো উড়িয়ে দিয়েছে। সবাই খবর পেয়েছে—স্বামী অপূর্ব্বানন্দ এসেছেন। এবার পায়ের ধূলো নিয়ে তোমার পায়ের তেলো হাঁটু পর্য্যন্ত খইয়ে দেবে। যাই হোক্, তুমি যে রকম আল্‌গা মানুষ দেখ্‌চি, সেই কথাটা আর কারো কাছে ফাঁস কোরো না—অংশীদার আর বাড়িয়ো না। কিন্তু ঠাকুর্দ্দা, লাভলোকসানের ঝুঁকি তোমাকেও নিতে হবে; অংশীদার হ'লেই হয় না; সব কথা ভেবে দেখো।

(প্রস্থান)

সন্ন্যাসী

ঠাকুর্দ্দা, আর তো দেরি ক'র্‌লে চ'ল্‌বে না। লোকজন জুট্‌তে আরম্ভ ক'রেছে, পুত্র দাও ধন দাও ক'রে আমাকে একেবারে মাটি ক'রে দেবে। ছেলেগুলিকে এইবেলা ডাকো। তারা ধন চায় না পুত্র চায় না, তাদের সঙ্গে খেলা জুড়ে দিলেই পুত্রধনের কাঙালরা আমাকে ত্যাগ ক'র্‌বে।

ঠাকুরদাদা

ছেলেদের আর ডাক্‌তে হবে না। ঐ যে আওয়াজ পাওয়া যাচ্চে! এলো ব'লে!

(লক্ষেশ্বরের পুনঃ প্রবেশ)

লক্ষেশ্বর

না বাবা, আমি পার্‌বো না! বুঝ্‌তে পার্‌চিনে। ও সব আমার কাজ নেই—আমার যা আছে সেই ভালো। কিন্তু তুমি আমাকে কী যেন মন্ত্র ক'রেছো। তোমার কাছ থেকে না পালালে আমার তো রক্ষে নেই! তুমি ঠাকুর্দ্দাকে নিয়েই কারবার করো, আমি চল্লেম।

(দ্রুত প্রস্থান)

(ছেলেদের প্রবেশ)

ছেলেরা

সন্ন্যাসী ঠাকুর! সন্ন্যাসী ঠাকুর!

সন্ন্যাসী

কী বাবা?

ছেলেরা

তুমি আমাদের নিয়ে খেলো!

সন্ন্যাসী

সে কি হয় বাবা! আমার কি সে ক্ষমতা আছে? তোমরা আমাকে নিয়ে খেলাও!

ছেলেরা

কী খেলা খেলবে?

সন্ন্যাসী

আমরা আজ শারদোৎসব খেল্‌বো।

প্রথম বালক

সে বেশ হবে।

দ্বিতীয় বালক

সে বেশ মজা হবে।

তৃতীয় বালক

সে কী খেলা ঠাকুর?

চতুর্থ বালক

সে কেমন ক'রে খেল্‌তে হয়?

সন্ন্যাসী

তবে এক কাজ করো। ঐ কাশবন থেকে কাশ তুলে নিয়ে এসো।

আঁচল ভ'রে ধানের মঞ্জরী আন্‌তে হবে। আর, তোমরা আজ শিউলি ফুলের মালা গেঁথে ঐ খানে ফেলে রেখে গেছ, সেগুলো নিয়ে এসো।

প্রথম বালক

কী ক'র্‌তে হবে ঠাকুর ?

সন্ন্যাসী

আমাকে তোমরা সাজিয়ে দেবে—আমি হবো শারদোৎসবের পুরোহিত।

সকলে

(হাততালি দিয়া)

হাঁ, হাঁ, হাঁ! সে বড়ো মজাই হবে।

(কাশগুচ্ছ প্রভৃতি আনিয়া ছেলেরা সকলে মিলিয়া সন্ন্যাসীকে সাজাইতে প্রবৃত্ত হইল)

(একদল লোকের প্রবেশ)

প্রথম ব্যক্তি

ও রে ছোঁড়াগুলো, সন্ন্যাসী কোথায় গেল রে!

দ্বিতীয় ব্যক্তি

ওতে যে অপরাধ হবে।

তৃতীয় বক্তি

ফেলো ফেলো তোমার জটা ফেলো।

চতুর্থ ব্যক্তি

দেখো না আবার গেরুয়া প'রেছে!

সন্ন্যাসী

জটাও ফেল্‌বো, গেরুয়াও ছাড়্‌বো, সবই হবে, খেলাটা সম্পূর্ণ হ'য়ে যাক্‌।

প্রথম ব্যক্তি

তবে যে আমাদের কে একজন ব'ল্‌লে কোথাকার কোন্ একজন স্বামী এসেছে!

সন্ন্যাসী

যদি বা এসে থাকে তাকে দিয়ে তোমাদের কোনো কাজ হবে না।

দ্বিতীয় ব্যক্তি

কেন? সে ভণ্ড না কি?

সন্ন্যাসী

তা নয় তো কি?

তৃতীয় ব্যক্তি

বাবা, তোমার চেহারাটি কিন্তু ভালো। তুমি মন্ত্রতন্ত্র কিছু শিখেছো?

সন্ন্যাসী

শেখ্‌বার ইচ্ছা তো আছে কিন্তু শেখায় কে?

তৃতীয় ব্যক্তি

একটি লোক আছে বাবা—সে থাকে ভৈরবপুরে, লোকটা [illegible]তালসিদ্ধ। একটি লোকের ছেলে মারা যাচ্ছিল, তা'র বাপ এসে ধ'রে প'ড়্‌তেই লোকটা করলে কি, সেই ছেলেটার প্রাণপুরুষকে একটা নেকড়ে বাঘের মধ্যে চালান্ ক'রে দিলে। ব'ল্‌লে বিশ্বাস ক'র্‌বে না, ছেলেটা মোলো বটে কিন্তু নেকড়েটা আজও দিব্যি বেঁচে আছে। না, হাস্‌ছো কি, আমার সম্বন্ধী স্বচক্ষে দেখে এসেছে। সেই নেকড়েটাকে মার্‌তে গেলে বাপ্ লাঠি হাতে ছুটে আসে। তাকে দু'বেলা ছাগল খাইয়ে লোকটা ফতুর হ'য়ে গেলো। বিদ্যে যদি শিখ্‌তে চাও তো সেই সন্ন্যাসীর কাছে যাও।

প্রথম ব্যক্তি

ওরে চল্ রে, বেলা হ'য়ে গেল। সন্ন্যাসী ফন্ন্যাসী সব মিথ্যে। সে কথা

আমি ত তখনি বলেছিলেম। আজকালকার দিনে কি আর সে রকম যোগবল আছে?

দ্বিতীয় ব্যক্তি

সে তো সত্যি, কিন্তু আমাকে যে কালুর মা বল্‌লে তার ভাগ্‌নে নিজের চক্ষে দেখে এসেছে, সন্ন্যাসী একটান গাঁজা টেনে কল্কেটা যেমনি উপুড় কর্‌লে অমনি তার মধ্যে থেকে এক ভাঁড় মদ আর একটা আস্ত মড়ার মাথার খুলি বেরিয়ে পড়্‌লো।

তৃতীয় ব্যক্তি

বলো কী, নিজের চক্ষে দেখেছে?

দ্বিতীয় ব্যক্তি

হাঁরে, নিজের চক্ষে বৈ কি!

তৃতীয় ব্যক্তি

আছে রে আছে, সিদ্ধপুরুষ আছে; ভাগ্যে যদি থাকে তবে তো দর্শন পাবো! তা চল্‌ না ভাই, কোন্‌ দিকে গেল একবার দেখে আসিগে!

(প্রস্থান)

সন্ন্যাসী

(বালকদের প্রতি)

বাবা, আজ যে তোমাদের সব সোনার রঙের কাপড় পর্‌তে হবে!

ছেলেরা

সোনার রঙের কাপড় কেন ঠাকুর?

সন্ন্যাসী

বাইরে যে আজ সোনা ঢেলে দিয়েছে। তারই সঙ্গে আমাদেরও আজ অন্তরে বাইরে মিলে যেতে হবে তা নইলে এই শরতের উৎসবে আমরা যোগ দিতে পার্‌বো কি করে? আজ এই আলোর সঙ্গে আকাশের সঙ্গে মিল্‌বে বলেই তো উৎসব।

ছেলেরা

সোনার রঙের কাপড় কোথায় পাবো ঠাকুর ?

সন্ন্যাসী

ঐ বেতসিনীর ধার দিয়ে যাও। যেখানে বটতলায় পোড়ো মন্দিরটা আছে, সেই মন্দিরটায় সমস্ত সাজানো আছে। ঠাকুর্দ্দা তুমি এদের সাজিয়ে আনোগে।

ঠাকুরদাদা

তবে চলো সবাই। (প্রস্থান)

সন্ন্যাসীর গান

রামকেলি—কাওয়ালী

নব কুন্দধবলদল-সুশীতলা,
অতি সুনির্ম্মলা, সুখ-সমুজ্জ্বলা,
শুভ সুবর্ণ আসনে অচঞ্চলা।
স্মিত উদয়ারুণ-কিরণ-বিলাসিনী,
পূর্ণসিতাংশু-বিভাস-বিকাশিনী,
নন্দনলক্ষ্মী সুমঙ্গলা।

(লক্ষেশ্বরের প্রবেশ)

লক্ষেশ্বর

দেখ ঠাকুর, তোমার মন্তর যদি ফিরিয়ে না নাও তো ভাল হবে না বল্‌চি। কী মুস্কিলেই ফেলেছো, আমার হিসেবের খাতা মাটি হয়ে গেল। একবার মনটা বলে যাই সোনার পদ্মর খোঁজে, আবার বলি থাক্‌গে ও সব বাজে কথা! একবার মনে ভাবি, এবার বুঝি তবে ঠাকুর্দ্দাই জিত্‌লে বা, আবার ভাবি মরুকগে ঠাকুর্দ্দা! ঠাকুর, এ তো ভালো কথা নয়! চেলা-ধরা ব্যবসা দেখ্‌চি তোমার! কিন্তু সে হবে না, কোনো মতেই হবে না!

চুপ করে হাস্‌চো কি! আমি বল্‌চি আমাকে পার্‌বে না—আমার শক্ত হাড়! লক্ষেশ্বর কোনোদিন তোমার চেলাগিরিতে ভিড়্‌বে না!

(প্রস্থান)

(ফুল লইয়া ছেলেদের প্রবেশ)

সন্ন্যাসী

এবার অর্ঘ্য সাজানো যাক্‌। এ যে টগর, এই বুঝি মালতী, শেফালিকাও অনেক এনেছো দেখ্‌ছি। সমস্তই শুভ্র, শুভ্র, শুভ্র! বাবা, এইবার সব দাঁড়াও! একবার পূর্ব্ব আকাশে দাঁড়িয়ে বেদ মন্ত্র প'ড়ে নিই।

বেদমন্ত্র

অক্ষি দুঃখোত্থিতস্যৈব সুপ্রসন্নে কনীনিকে।
আংক্তে চাদ্‌গণং নাস্তি ঋভূনাং তন্নিবোধত।
কনকাভানি বাসাংসি অহতানি নিবোধত।
অন্নমশ্নীত মৃজ্মীত অহং বো জীবনপ্রদঃ।
এতা বাচঃ প্রযুজ্যন্তে শরদ্‌যত্রোপদৃশ্যতে॥

এবারে সকলে মিলে তোমারের শারদোৎসবের আবাহন-গানটি গাইতে গাইতে বনপথ প্রদক্ষিণ ক'রে এসো। ঠাকুর্দ্দা, তুমি গানটি ধরিয়ে দাও! তোমাদের উৎসবের গানে বনলক্ষ্মীদের জাগিয়ে দিতে হবে।

গান

মিশ্র রামকেলি—একতালা

আমরা বেঁধেছি কাশের গুচ্ছ, আমরা
গেঁথেছি শেফালি মালা।
নবীন ধানের মঞ্জরী দিয়ে
সাজিয়ে এনেছি ডালা।

এসো গো শারদলক্ষ্মী, তোমার
শুভ্র মেঘের রথে,
এসো নির্ম্মল নীল পথে,
এসো ধৌত শ্যামল আলো-ঝলমল
বনগিরি পর্ব্বতে।
এসো মুকুটে পরিয়া শ্বেত শতদল
শীতল শিশির-ঢালা॥
ঝরা মাতলীর ফুলে
আসন-বিছানো নিভৃত কুঞ্জে
ভরা গঙ্গার কূলে,
ফিরিছে মরাল ডানা পাতিবারে
তোমার চরণ-মূলে।
গুঞ্জরতান তুলিয়ো তোমার
সোনার বীণার তারে
মৃদু মধু ঝঙ্কারে,
হাসি-ঢালা সুর গলিয়া পড়িবে
ক্ষণিক অশ্রুধারে।
রহিয়া রহিয়া যে-পরশমণি
ঝলকে অলক-কোণে,
পলকের তরে সকরুণ করে
বুলায়ো বুলায়ো মনে।
সোনা হ'য়ে যাবে সকল ভাবনা,
আঁধার হইবে আলা॥

সন্ন্যাসী

পৌঁচেছে, তোমাদের গান আজ একেবারে আকাশের পারে গিয়ে পৌঁচেছে! দ্বার খুলেছে তাঁর! দেখ্‌তে পাচ্চো কি, শারদা বেরিয়েছেন! দেখ্‌তে পাচ্চো না! দূরে, দূরে, সে অনেক দূরে, বহু বহু দূরে। সেখানে চোখ যে যায় না! সেই জগতের সকল আরম্ভের প্রান্তে, সেই উদয়াচলের প্রথমতম শিখরটির কাছে; যেখানে প্রতিদিন উষার প্রথম পদক্ষেপটি পড়্‌লেও তবু তাঁর আলো চোখে এসে পৌঁছায় না, অথচ ভোরের অন্ধকারের সর্ব্বাঙ্গে কাঁটা দিয়ে ওঠে—সেই অনেক দূরে। সেইখানে হৃদয়টি মেলে দিয়ে স্তব্ধ হয়ে থাকো, ধীরে ধীরে একটু একটু করে দেখ্‌তে পাবে। আমি ততক্ষণ আগমনীর গানটি গাইতে থাকি।

গান

ভৈরবী—একতালা

লেগেছে অমল ধবল পালে মন্দ মধুর হাওয়া।
দেখি নাই, কভু দেখি নাই এমন তরণী-বাওয়া।
কোন্ সাগরের পার হ'তে আনে
কোন্ সুদূরের ধন!
ভেসে যেতে চায় মন,
ফেলে যেতে চায় এই কিনারায়
সব চাওয়া সব পাওয়া॥
পিছনে ঝরিছে ঝর ঝর জল
গুরু গুরু দেয়া ডাকে,
মুখে এসে পড়ে অরুণ কিরণ
ছিন্ন মেঘের ফাঁকে।

ওগো কাণ্ডারী, কেগো তুমি, কার
হাসিকান্নার ধন!
ভেবে মরে মোর মন
কোন্ সুরে আজ বাঁধিবে যন্ত্র
কী মন্ত্র হবে গাওয়া॥

এবারে আর দেখ্‌তে পাইনি বলবার জো নেই।

প্রথম বালক

কই ঠাকুর, দেখিয়ে দাও না।

সন্ন্যাসী

ঐ যে শাদা মেঘ ভেসে আস্‌চে।

দ্বিতীয় বালক

হাঁ হাঁ, ভেসে আস্‌চে!

তৃতীয় বালক

হাঁ, আমিও দেখেচি!

সন্ন্যাসী

ঐ যে আকাশ ভ'রে গেল!

প্রথম বালক

কিসে?

সন্ন্যাসী

কিসে! এই তো স্পষ্টই দেখা যাচ্চে আলোতে, আনন্দে! বাতাসে শিশিরের পরশ পাচ্চো না?

দ্বিতীয় বালক

হাঁ, পাচ্চি।

সন্ন্যাসী

তবে আর কি ! চক্ষু সার্থক হ'য়েচে, শরীর পবিত্র হ'য়েচে, মন প্রশান্ত হ'য়েচে। এসেচেন, এসেচেন, আমাদের মাঝখানেই এসেচেন। দেখ্‌চো না বেতসিনী নদীর ভাবটা ! আর ধানের ক্ষেত কি রকম চঞ্চল হ'য়ে উঠেচে ! গাও গাও, ঠাকুর্দ্দা, বরণের গানটা গাও !

ঠাকুরদাদার গান

আলেয়া—একতালা

আমার নয়ন-ভুলানো এলে।
আমি কী হেরিলাম হৃদয় মেলে !

সন্ন্যাসী

যাও, বাবা, তোমরা সমস্ত বনে বনে নদীর ধারে ধারে গেয়ে এসোগে।

(ছেলেদের গাহিতে গাহিতে প্রস্থান)

ঠাকুরদাদা

প্রভু, আমি যে একেবারে ডুবে গিয়েছি ; ডুবে গিয়ে তোমার এই পায়ের তলাটিতে এসে ঠেকেচি। এখান থেকে আর ন'ড়্‌তে পার্‌বো না।

(লক্ষেশ্বরের প্রবেশ)

ঠাকুরদাদা

এ কী হ'লো ! লখা গেরুয়া ধরেচো যে !

লক্ষেশ্বর

সন্ন্যাসী ঠাকুর, এবার আর কথা নেই। আমি তোমারই চেলা। এই নাও আমার গজমোতির কৌটো—এই আমার মনি-মাণিক্যের পেটিকা তোমারি কাছে রইলো। দেখো ঠাকুর, সাবধানে রেখো !

সন্ন্যাসী

তোমার এমন মতি কেন হ'লো লক্ষেশ্বর ?

লক্ষেশ্বর

সহজে হয়নি প্রভু! সম্রাট বিজয়াদিত্যের সৈন্য আস্‌চে। এবার আমার ঘরে কি আর কিছু থাক্‌বে? তোমার গায়ে তো কেউ হাত দিতে পার্‌বে না, এ সমস্ত তোমার কাছেই রাখ্‌লেম। তোমার চেলাকে তুমি রক্ষা করো, বাবা, আমি তোমার শরণাগত।

(রাজার প্রবেশ)

রাজা

সন্ন্যাসী ঠাকুর!

সন্ন্যাসী

বোসো, বোসো, তুমি যে হাঁপিয়ে পড়েচো! একটু বিশ্রাম করো!

রাজা

বিশ্রাম ক'রবার সময় নেই। ঠাকুর, চরের মুখে সংবাদ পাওয়া গেল যে, বিজয়াদিত্যের পতাকা দেখা দিয়েচে—তাঁর সৈন্যদল আস্‌চে!

সন্ন্যাসী

বলো কী! বোধ হয় শরৎকালের আনন্দে তাঁকে আর ঘরে [illegible]ক্‌তে দেয়নি। তিনি রাজ্যবিস্তার ক'র্‌তে বেরিয়েচেন।

রাজা

কি সর্ব্বনাশ! রাজ্যবিস্তার ক'র্‌তে বেরিয়েচেন!

সন্ন্যাসী

বাবা, এতে দুঃখিত হ'লে চ'ল্‌বে কেন? তুমিও তো রাজ্যবিস্তার ক'রবার জন্যে বেরবার উদ্যোগে ছিলে!

রাজা

না, সে হ'লো স্বতন্ত্র কথা। তাই ব'লে আমার এই রাজ্যটুকুতে—তা সে যাই হোক্, আমি তোমার শরণাগত। এই বিপদ হ'তে আমাকে বাঁচাতেই

হবে। বোধ হয়, কোন দুষ্টলোক তাঁর কাছে লাগিয়েচে যে আমি তাঁকে লঙ্ঘন ক'রতে ইচ্ছা ক'রেচি; তুমি তাঁকে ব'লো সে কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা, সর্ব্বৈব মিথ্যা। আমি কী এম্‌নি উন্মত্ত? আমার রাজচক্রবর্ত্তী হবার দরকার কী? আমার শক্তিই বা এমন কী আছে?

সন্ন্যাসী

ঠাকুর্দ্দা!

ঠাকুরদাদা

কী প্রভু?

সন্ন্যাসী

দেখ, আমি কৌপীন প'রে এবং গুটিকতক ছেলেকেমাত্র নিয়ে শারদোৎসব কেমন জ'মিয়ে তুলেছিলেম আর ঐ চক্রবর্ত্তী সম্রাট্‌টা তা'র সমস্ত সৈন্যসামন্ত নিয়ে এমন দুর্লভ উৎসব কেবল নষ্টই ক'রতে পারে। লোকটা কী রকম দুর্ভাগা দেখেচো!

রাজা

চুপ করো, চুপ করো, ঠাকুর, কে আবার কোন্ দিক থেকে শুন্‌তে পাবে!

সন্ন্যাসী

ঐ বিজয়াদিত্যের পরে আমার—

রাজা

আরে চুপ, চুপ। তুমি সর্ব্বনাশ ক'র্‌বে দেখ্‌চি! তাঁর প্রতি তোমার মনের ভাব যাই থাক্, সে তুমি মনেই রেখে দাও!

সন্ন্যাসী

তোমার সঙ্গে পূর্ব্বেও তো সে বিষয়ে কিছু আলোচনা হ'য়ে গেছে!

রাজা

কী মুস্কিলেই পড়্‌লেম! সে সব কথা কেন ঠাকুর, সে এখন থাক্ না! ওহে লক্ষেশ্বর, তুমি এখানে ব'সে ব'সে কী শুন্‌চো! এখান থেকে যাও না!

লক্ষেশ্বর

মহারাজ, যাই এমন আমার সাধ্য কি আছে? একেবারে পাথর দিয়ে চেপে রেখেচে! যমে না নড়ালে আমার আর নড়চড় নেই। নইলে মহারাজের সাম্‌নে আমি যে ইচ্ছাসুখে বসে থাকি এমন আমার স্বভাবই নয়।

(বিজয়াদিত্যের অমাত্যগণের প্রবেশ)

মন্ত্রী

জয় হোক্ মহারাজাধিরাজচক্রবর্ত্তী বিজয়াদিত্য!

(ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম)

রাজা

আরে করেন কী, করেন কী! আমাকে পরিহাস ক'র্‌চেন নাকি? আমি বিজয়াদিত্য নই। আমি তাঁর চরণাশ্রিত সামন্ত সোমপাল।

মন্ত্রী

মহারাজ, সময় তো অতীত হ'য়েচে, এক্ষণে রাজধানীতে ফিরে চলুন।

সন্ন্যাসী

ঠাকুর্দ্দা, পূর্ব্বেই তো ব'লেছিলেম পাঠশালা ছেড়ে পালিয়েচি, কিন্তু গুরুমহাশয় পিছন পিছন তাড়া ক'রেচেন।

ঠাকুরদাদা

প্রভু এ কী কাণ্ড! আমি তো স্বপ্ন দেখ্‌চিনে?

সন্ন্যাসী

স্বপ্ন তুমিই দেখ্‌চো কি এঁরাই দেখ্‌চেন তা' নিশ্চয় ক'রে কে ব'ল্‌বে?

ঠাকুরদাদা

তবে কি—

সন্ন্যাসী

হাঁ, এঁরা কয়জনে আমাকে বিক্রমাদিত্য ব'লেই তো জানেন !

ঠাকুরদাদা

প্রভু, আমিই তো তবে জিতেছি ! এই কয়দণ্ডে আমি তোমার ে
পরিচয়টি পেয়েছি তা' এঁরা পর্য্যন্ত পান্‌নি ! কিন্তু বড় সঙ্কটে ফেল্লে যে
ঠাকুর !

লক্ষেশ্বর

আমিও বড় সঙ্কটে প'ড়েছি মহারাজ ! আমি সম্রাটের হাত থে
বাঁচ্‌বার জন্যে সন্ন্যাসীর হাতে ধরা দিয়েছি, এখন আমি যে কার হাতে আ
সেটা ভেবেই পাচ্চিনে।

রাজা

মহারাজ, দাসকে কি পরীক্ষা ক'রতে বেরিয়েছিলেন ?

সন্ন্যাসী

না সোমপাল, আমি নিজের পরীক্ষাতেই বেরিয়েছিলেম।

রাজা

(জোড়হস্তে) এই অপরাধীর প্রতি মহারাজের কী বিধান ?

সন্ন্যাসী

বিশেষ কিছুই না। তোমার কাছে যে কয়টা বিষয়ে প্রতিশ্রুত অ
সে আমি সেরে দিয়ে যাবো।

রাজা

আমার কাছে আবার প্রতিশ্রুত !

সন্ন্যাসী

তা'র মধ্যে একটা তো উদ্ধার ক'রেচি। বিজয়াদিত্য যে তোমাদের কলের সমান, সে যে নিতান্ত সাধারণ মানুষ, সেটা তো ফাঁস হ'য়েচে। জের এই পরিচয়টুকু পাবার জন্যেই রাজতক্ত ছেড়ে সন্ন্যাসী সেজে সকল াকের মাঝখানে নেবে এসেছিলেম। এখন তোমার একটা কিছু কাজ 'রে দিয়ে যাবো এই প্রতিশ্রুতিটি রক্ষা ক'রতে হবে। বিজয়াদিত্যকে তামার সভায় আজই হাজির ক'রে দেবো—তা'কে দিয়ে তোমার কোন্ াজ করাতে চাও বলো!

রাজা

(নতশিরে) তাঁকে দিয়ে আমার অপরাধ মার্জ্জনা করাতে চাই।

সন্ন্যাসী

তা বেশ কথা। আমাকে যদি সম্রাট ব'লে মানো, তবে আমার সম্বন্ধে তামার যা কিছু অপরাধ সে রাজকার্য্যেরই ত্রুটি। সে রকম যদি কিছু ঘটে াকে তবে আমি কয়েকদিন তোমার রাজ্যে থেকে সে সমস্তই স্বহস্তে মার্জ্জনা 'রে দিয়ে যাবো।

রাজা

মহারাজ; আপনি যে শরতের বিজয়যাত্রায় বেরিয়েচেন, আজ তা'র রিচয় পাওয়া গেল। আজ এমন হা'র আনন্দে হেরেচি, কোনো যুদ্ধে এমন্‌টি ঘট্‌তে পার্‌তো না। আমি যে আপনার অধীন এই গৌরবই আমার কল যুদ্ধজয়ের চেয়ে বড়ো হ'য়ে উঠেছে। কী ক'রলে আমি রাজত্ব ক'র্‌বার পযুক্ত হব সেই উপদেশটি চাই।

সন্ন্যাসী

উপদেশটি কথায় ছোট, কাজে অত্যন্ত বড়ো। রাজা হ'তে গেলে সন্ন্যাসী ওয়া চাই।

রাজা

উপদেশটি মনে রাখ্‌বো, পেরে উঠ্‌বো ব'লে ভরসা হয় না।

লক্ষেশ্বর

আমাকেও ঠাকুর—না, না, মহারাজ,—ঐ রকম একটা কী উপদে দিয়েছিলেন, সে আমি পেরে উঠ্‌লেম্ না, বোধ করি মনে রাখ্‌তেও পারবো না।

সন্ন্যাসী

উপদেশে বোধ করি তোমার বিশেষ প্রয়োজন নেই!

লক্ষেশ্বর

আজ্ঞা না।

(উপনন্দের প্রবেশ)

উপনন্দ

ঠাকুর, এ কি, রাজা যে! এরা সব কা'রা!

(পলায়নোদ্যম)

সন্ন্যাসী

এসো, এসো, বাবা, এসো! কী বল্‌ছিলে বলো! (উপনন্দ নিরুত্তর) এঁদের সাম্‌নে বল্‌তে লজ্জা কর্‌চো? আচ্ছা, তবে সোমপাল একটু অবস নাও! তোমরাও——

উপনন্দ

সে কী কথা! ইনি যে আমাদের রাজা, এঁর কাছে আমাকে অপরাধ কোরো না। আমি তোমাকে ব'ল্‌তে এসেছিলেম এই ক'দিন পুঁথি লি আজ তা'র পারিশ্রমিক তিন কাহন পেয়েছি। এই দেখো!

সন্ন্যাসী

আমার হাতে দাও বাবা! তুমি ভাব্‌চো এই তোমার বহুমূল্য তি কার্ষাপণ আমি লক্ষেশ্বরের হাতে ঋণশোধের জন্য দেবো? এ আমি নিজে

নলেম! আমি এখানে সারদার উৎসব করেছি এ আমার তা'রি দক্ষিণা।
কী বলো বাবা!

উপনন্দ

ঠাকুর তুমি নেবে?

সন্ন্যাসী

নেবো বই কি। তুমি ভাব্‌চ সন্ন্যাসী হ'য়েছি ব'লেই আমার কিছুতে লোভ নেই? এ সব জিনিষে আমার ভারি লোভ।

লক্ষেশ্বর

সর্ব্বনাশ! তবেই হ'য়েচে! ডাইনের হাতে পুত্র সমর্পণ ক'রে ব'সে আছি দেখ্‌চি!

সন্ন্যাসী

ওগো শ্রেষ্ঠী!

শ্রেষ্ঠী

আদেশ করুন।

সন্ন্যাসী

এই লোকটিকে হাজার কার্ষাপণ গুণে দাও!

শ্রেষ্ঠী

যে আদেশ!

উপনন্দ

তবে ইনিই কি আমাকে কিনে নিলেন?

সন্ন্যাসী

উনি তোমাকে কিনে নেন ওঁর এমন সাধ্য কি! তুমি আমার!

উপনন্দ

(পা জড়াইয়া ধরিয়া)

আমি কোন পুণ্য করেছিলেম যে আমার এমন ভাগ্য হ'লো!

সন্ন্যাসী

ওগো সুভূতি !

মন্ত্রী

আজ্ঞা !

সন্ন্যাসী

আমার পুত্র নেই ব'লে তোমরা সর্ব্বদা আক্ষেপ ক'র্‌তে। এবারে সন্ন্যাসধর্ম্মের জোরে এই পুত্রটি লাভ ক'রেচি।

লক্ষেশ্বর

হায় হায় আমার বয়স বেশি হ'য়ে গেছে ব'লে কী সুযোগটাই পেরিয়ে গেলো !

মন্ত্রী

বড় আনন্দ। তা ইনি কোন্ রাজগৃহে—

সন্ন্যাসী

ইনি যে-গৃহে জন্মেচেন সে গৃহে জগতের অনেক বড় বড় বীর জন্মগ্রহণ ক'রেচেন—পুরাণ ইতিহাস খুঁজে সে আমি তোমাকে পরে দেখিয়ে দেবো। লক্ষেশ্বর !

লক্ষেশ্বর

কী আদেশ !

সন্ন্যাসী

বিজয়াদিত্যের হাত থেকে তোমার মণিমাণিক্য আমি রক্ষা ক'রেছি এই তোমাকে ফিরে দিলেম।

লক্ষেশ্বর

মহারাজ, যদি গোপনে ফিরিয়ে দিতেন তা হ'লেই যথার্থ রক্ষা ক'র্‌তেন, এখন রক্ষা করে কে ?

সন্ন্যাসী

এখন বিজয়াদিত্য স্বয়ং রক্ষা ক'র্‌বেন তোমার ভয় নেই। কিন্তু তোমার ছে আমার কিছু প্রাপ্য আছে।

লক্ষেশ্বর

সর্ব্বনাশ ক'র্‌লে!

সন্ন্যাসী

ঠাকুর্দ্দা সাক্ষী আছেন।

লক্ষেশ্বর

এখন সকলেই মিথ্যে সাক্ষ্য দেবে।

সন্ন্যাসী

আমাকে ভিক্ষা দিতে চেয়েছিলে। তোমার কাছে এক মুঠো চা'ল পাওনা আছে। রাজার মুষ্টি কি ভরাতে পার্‌বে?

লক্ষেশ্বর

মহারাজ, আমি সন্ন্যাসীর মুষ্টি দেখেই কথাটা পেড়েছিলেম।

সন্ন্যাসী

তবে তোমার ভয় নেই, যাও!

লক্ষেশ্বর

মহারাজ, ইচ্ছে করেন যদি তবে এইবার কিছু উপদেশ দিতে পারেন।

সন্ন্যাসী

এখনো দেরী আছে।

লক্ষেশ্বর

তবে প্রণাম হই! চারদিকে সকলেই কৌটোটার দিকে বড্ডো তাকাচ্চে! (প্রস্থান)

সন্ন্যাসী

রাজা সোমপাল, তোমার কাছে আমার একটি প্রার্থনা আছে।

রাজা

সে কি কথা! সমস্তই মহারাজের, যে আদেশ ক'রবেন,—

সন্ন্যাসী

তোমার রাজ্য থেকে আমি একটি বন্দী নিয়ে যেতে চাই।

রাজা

যাকে ইচ্ছা নাম করুন সৈন্য পাঠিয়ে দিচ্ছি! না হয় আমি নিজেই যাবো।

সন্ন্যাসী

বেশী দূরে পাঠাতে হবে না। (ঠাকুরদাদাকে দেখাইয়া) তোমার এই প্রজাটিকে চাই!

রাজা

কেবলমাত্র এঁকে! মহারাজ যদি ইচ্ছা করেন তবে আমার রাজ্যে যে শ্রুতিধর স্মৃতিভূষণ আছেন তাঁকে আপনার সভায় নিয়ে যেতে পারেন।

সন্ন্যাসী

না, অত বড় লোককে নিয়ে আমার সুবিধা হবে না; আমি এঁকেই চাই। আমার প্রাসাদে অনেক জিনিষ আছে, কেবল বয়স্য নেই।

ঠাকুরদাদা

বয়সে মিল্‌বে না প্রভু, গুণেও না; তবে কিনা ভক্তি দিয়ে সমস্ত অমিল ভ'রিয়ে তুল্‌তে পার্‌বো, এই ভরসা আছে।

সন্ন্যাসী

ঠাকুর্দ্দা, সময় খারাপ হ'লে বন্ধুরা পালায় তাইতো দেখ্‌চি! আমার উৎসবের বন্ধুরা এখন সব কোথায়? রাজদ্বারের গন্ধ পেয়েই দৌড় দিয়েচে না কি!

ঠাকুরদাদা

কা'রো পালাবার পথ কী রেখেচো ? আটঘাট ঘিরে ফেলেচো যে। ঐ আস্‌চে !

(বালকগণের প্রবেশ)

সকলে

সন্ন্যাসীঠাকুর, সন্ন্যাসীঠাকুর !

সন্ন্যাসী

(উঠিয়া দাঁড়াইয়া)

এসো, বাবা, সব এসো !

সকলে

একী ! এ যে রাজা ! আরে পালা, পালা ! (পলায়নোদ্যম)

ঠাকুরদাদা

আরে পালাস্‌নে ! পালাস্‌নে !

সন্ন্যাসী

তোমরা পালাবে কি, উনিই পালাচ্চেন। যাও সোমপাল, সব প্রস্তুত করগে, আমি যাচ্চি।

রাজা

যে আদেশ।

(প্রস্থান)

বালকেরা

আমরা বনে পথে সব জায়গায় গেয়ে গেয়ে এসেছি ; এইবার এখানে গান শেষ করি !

ঠাকুরদাদা

হাঁ ভাই, তোরা ঠাকুরকে প্রদক্ষিণ ক'রে ক'রে গান গা।

সকলের গান

আলেয়া—একতালা

আমার নয়ন-ভুলানো এলে।
আমি কী হেরিলাম হৃদয় মেলে!
শিউলি-তলার পাশে পাশে,
ঝরা ফুলের রাশে রাশে,
শিশির-ভেজা ঘাসে ঘাসে
অরুণ-রাঙা চরণ ফেলে
নয়ন-ভুলানো এলে॥
আলো-ছায়ার আঁচলখানি
লুটিয়ে পড়ে বনে বনে,
ফুলগুলি ঐ মুখে চেয়ে
কী কথা কয় মনে মনে।
তোমায় মোরা ক'র্‌বো বরণ,
মুখের ঢাকা করো হরণ,
ঐটুকু ঐ মেঘাবরণ
দু'হাত দিয়ে ফেলো ঠেলে।
নয়ন-ভুলানো এলে॥
বনদেবীর দ্বারে দ্বারে
শুনি গভীর শঙ্খধ্বনি,
আকাশবীণার তারে তারে
জাগে তোমার আগমনী।

কোথায় সোনার নূপুর বাজে ?
বুঝি আমার হিয়ার মাঝে,
সকল ভাবে, সকল কাজে
পাষাণ-গালা সুধা ঢেলে—
নয়ন-ভুলানো এলে ॥

বসন্ত

রাজা

কবি !

কবি

কী মহারাজ ?

রাজা

আমি মন্ত্রণাসভা থেকে পালিয়ে এসেচি।

কবি

সৎকার্য্য ক'রেচেন। কিন্তু মহারাজের এমন সুমতি হ'লো কেন ?

রাজা

বৎসর শেষ হ'য়ে এলো, রাজকোষ শূন্যপ্রায়। মন্ত্রণাসভায় ব'স্‌লেই স
আসেন, তাঁদের নিজ বিভাগের জন্যে টাকা দাবী ক'র্‌তে। কাজেই প
ছাড়া গতি নেই।

কবি

এতে উপকার হবে।

রাজা

কার উপকার হবে ?

কবি

রাজ্যের।

রাজা

সে কী কথা ?

কবি

রাজা মাঝে মাঝে স'রে দাঁড়ালে প্রজারা রাজত্ব ক'র্‌বার অবকাশ

রাজা

তা'র অর্থ কী হ'লো ?

কবি

রাজার অর্থ যখন শূন্যে এসে ঠেকে, প্রজা তখন নিজের অর্থ খুঁজে বের করে, তাতেই তা'র রক্ষা।

রাজা

কবি, তোমার কথাগুলো বাঁকা ঠেক্‌চে। মন্ত্রণাসভা ছেড়ে এসেচি, আবার তোমার সঙ্গও ছাড়্‌তে হবে না কি ?

কবি

না, তা'র দরকার হবে না। আপনি যখন পলাতক তখন তো আমাদেরই দলে এসে পড়েচেন।

রাজা

তোমার দলে ?

কবি

হাঁ মহারাজ, আমি জন্মপলাতক।

গান

আমরা বাস্তুছাড়ার দল,
ভবের পদ্মপত্রে জল ;
আমরা ক'র্‌চি টলমল।
মোদের আসাযাওয়া শূন্যহাওয়া
নাইকো ফলাফল॥

রাজা

তুমি আমাকে দলে টান্‌তে চাও ? অতদূর এগোতে পার্‌বো না। আমাকে মন্ত্রীরা মিলে সভাছাড়া ক'র্‌চে, তাই বলে কি কবির দলে ভিড়ে' শেষে—

কবি

শুধু আমাকে দেখে ভয় পাবেন না, এ দলে আপনি রাজসঙ্গীও পাবেন

রাজা

রাজসঙ্গী ? কে বলো তো ?

কবি

ঋতুরাজ।

রাজা

ঋতুরাজ ? বসন্ত ?

কবি

হাঁ মহারাজ। তিনি চিরপলাতক। আমারই মতো। পৃথ্বী তঁ সিংহাসনে বসিয়ে পৃথ্বীপতি ক'র্‌তে চেয়েছিলো কিন্তু তিনি—

রাজা

বুঝেচি, বোধ করি রাজকোষের অবস্থা দেখে পালাতে ইচ্ছে ক'র্‌চেন

কবি

পৃথিবীর রাজকোষ পূর্ণ ক'রে দিয়ে তিনি পালান।

রাজা

কী দুঃখে ?

কবি

দুঃখে নয়, আনন্দে।

রাজা

কবি, তোমার হেঁয়ালি রাখো, আমার অধ্যাপকের দল তোমার ে শুনে রাগ করে, বলে ওগুলোর কোনো অর্থ নেই। আজ বসন্ত-উ কী পালা তৈরি ক'রেচ সেইটে বলো।

কবি

আজ সেই পলাতকার পালা।

রাজা

বেশ, বেশ। বুঝ্‌তে পারবো তো?

কবি

বোঝাবার চেষ্টা করি নি।

রাজা

তাতে ক্ষতি নেই। কিন্তু না বোঝাবার চেষ্টা করনি তো?

কবি

না মহারাজ, এতে মূলেই অর্থ নেই, বোঝা না বোঝার কোন বালাই নই, কেবল এতে সুর আছে।

রাজা

আচ্ছা বেশ, সুরু হোক্। কিন্তু ওদিকে মন্ত্রণাসভার কাজ চ'ল্‌চে, াওয়াজ শুনে মন্ত্রীরা তো—

কবি

হাঁ মহারাজ, তাঁরা সুদ্ধ হয়তো পলাতকার দলে যোগ দিতে পা তাতে দোষ কী হ'য়েচে? ফাল্গুন যে প'ড়েচে।

রাজা

সর্ব্বনাশ! এখানে এসে যদি আবার—

কবি

ভয় নেই। শূন্যকোষের কথাটা স্মরণ ক'রিয়ে দেবার ভারই মন্ত্রীদের ই, কিন্তু শূন্যকোষের কথা ভুলিয়ে দেবার ভারইতো কবির উপরে।

রাজা

তা হ'লে ভালো কথা। তা হ'লে আর দেরি নয়। ভোলবার অত্যন্ত কার হ'য়েছে। দলবল সব প্রস্তুত তো? আমাদের নাট্যাচার্য্য দিনপতি—

কবি

ঐ তো তিনি ভারতীর কমলবনের মধুগন্ধে বিহ্বল হ'য়ে ব'সে আছেন।

রাজা

দেখে মনে হ'চ্চে বটে শূন্য রাজকোষের কথায় ওঁর কিছুমাত্র খেয়াল নেই।

কবি

উনি আমাদের উৎসবের বন্ধু, দুর্ভিক্ষের দিনে ওঁকে না হ'লে চলে না। কারণ উনি ক্ষুধার কথা সুধা দিয়ে ভোলান।

রাজা

সাধু! আমার মন্ত্রীদের সঙ্গে ওঁর পরিচয় ক'রিয়ে দিতে হবে। বিশেষত আমার অর্থ-সচিবের সঙ্গে। তিনি অত্যন্ত গম্ভীর হ'য়ে আছেন। তাঁর মনে যদি পুলক সঞ্চার ক'রতে পারেন তা' হ'লে—

কবি

ফস্ ক'রে বেশী আশা দিয়ে ফেল্‌বেন না—রাজকোষের অবস্থা যে রকম—

রাজা

হাঁ হাঁ বটে বটে!—আচ্ছা, তবে তোমার পালা আরম্ভ হবে কী দিয়ে?

কবি

ঋতুরাজ আস্‌বেন, প্রস্তুত হবার জন্যে আকাশে একটা ডাক প'ড়েচে।

রাজা

ব'ল্‌চে কী?

কবি

বল্‌চে, সব দিয়ে ফেল্‌তে হবে।

রাজা

নিজেকে একেবারে শূন্য ক'রে? সর্ব্বনাশ!

কবি

না, নিজেকে পূর্ণ ক'রে। নইলে দেওয়া তো ফাঁকি দেওয়া।

রাজা

মানে কি হ'লো?

কবি

যে দেওয়া সত্যি, সে দেওয়াতে ভক্তি করে। বসন্ত-উৎসবে দানের দ্বারাই ধরণী ধনী হ'য়ে উঠ্‌বে।

রাজা

তা হ'লে ধরণীর সঙ্গে ধরণীপতির ঐখানে অমিল দেখ্‌তে পাচ্চি। আমি তো দান কর্ত্তে গিয়ে প্রায়ই বিপদে পড়ি—অর্থসচিবের মু[illegible] অত্যন্ত গম্ভীর হ'তে থাকে।

কবি

যে-দান সত্য, তা'র দ্বারা বাইরের ধন বিনাশ পায়, অন্তরের ধন বিকাশ পেতে থাকে।

রাজা

ও আবার কী? এটা উপদেশের মত শোনাচ্চে, কবি।

কবি

তা' হ'লে আর দেরী নয়, গান সুরু হোক্!

বসন্তের পরিচরগণ

সব দিবি কে, সব দিবি পায়।

আয় আয় আয়।

ডাক্ প'ড়েছে ঐ শোনা যায়,

আয় আয় আয়॥

আস্‌বে যে সে স্বর্ণরথে,
জাগ্‌বি কারা রিক্ত পথে
পৌষ-রজনী, তাহার আশায়।
আয় আয় আয়॥
ক্ষণেক কেবল তাহার খেলা;
হায় হায় হায়!
তার পরে তা'র যাবার বেলা;
হায় হায় হায়!
চ'লে গেলে জাগ্‌বি যবে
ধন রতন বোঝা হবে,
বহন করা হবে যে দায়।
হায় হায় হায়॥

রাজা

দাবী তো কম নয়।

কবি

দাবী বড়ো হ'লেই দান সহজ হয়; ছোটো হ'লেই কৃপণতা জাগায়।

রাজা

তা এরা সব রাজি আছে?

কবি

ওদেরই মুখে শুনে নিন্।

বনভূমি

বাকি আমি রাখ্‌বো না কিছুই।
তোমার চলার পথে পথে
ছেয়ে দেবো ভুঁই।

ওগো মোহন, তোমার উত্তরীয়
গন্ধে আমার ভ'রে নিয়ো,
উজাড় ক'রে দেবো পায়ে
বকুল বেলা জুঁই ॥
দখিন সাগর পার হ'য়ে যে
এলে পথিক তুমি,
আমার সকল দেবো অতিথিরে,
আমি বনভূমি।
আমার কুলায় ভরা র'য়েছে গান,
সব তোমারেই ক'রেছি দান,
দেবার কাঙাল করে আমায়
চরণ যখন ছুঁই ॥

আম্রকুঞ্জ

'ফল ফলাবার আশা আমি মনেই রাখিনিরে।
আজ আমি তাই মুকুল ঝরাই দক্ষিণ সমীরে ॥
বসন্ত-গান পাখীরা গায়,
বাতাসে তা'র সুর ঝ'রে যায়,
মুকুল ঝরার ব্যাকুল খেলা
আমারি সেই রাগিণীরে ॥
জানিনে ভাই, ভাবিনে তাই কী হবে মোর দশা,
যখন আমার সারা হবে সকল ঝরা খসা।

এই কথা মোর শূন্যডালে
বাজ্‌বে সেদিন তালে তালে,
"চরম দেওয়ায় সব দিয়েছি
মধুর মধু-যামিনীরে॥"

রাজা

ভাবখানা বুঝেচি, কবি।

কবি

কী বুঝ্‌লেন?

রাজা

ফল ফলাবো ব'লে কোমর বেঁধে ব'স্‌লে ফল ফলে না। মনের আনে ফল চাইনে ব'ল্‌তে পার্‌লে, ফল আপনি ফ'লে ওঠে। আম্রকুঞ্জ মুকুল ঝরাে ভরসা পায় বলেই তার ফল ধরে।

কবি

মহারাজ, এটা যেন উপদেশের মতো শোনাচ্চে।

রাজা

ঠিক কথা। তা হ'লে গান ধরো।

করবী

যদি তা'রে নাই চিনি গো
সে কি আমায় নেবে চিনে
এই নব ফাল্গুনের দিনে?
(জানিনে জানিনে)
সে কি আমার কুঁড়ির কানে
কবে কথা গানে গানে,

পরাণ তাহার নেবে কিনে
এই নব ফাল্গুনের দিনে ?
(জানিনে জানিনে)
সে কি আপন রঙে ফুল রাঙাবে ?
সে কি মর্ম্মে এসে ঘুম ভাঙাবে ?
ঘোম্‌টা আমার নতুন পাতার
হঠাৎ দোলা পাবে কি তার ?
গোপন কথা নেবে জিনে
এই নব ফাল্গুনের দিনে ?
(জানিনে জানিনে)

রাজা

ওদিকে ও কিসের গোলমাল শুন্‌তে পাই ?

কবি

দখিন হাওয়া যে এলো।

রাজা

তা হয়েচে কি ?

কবি

বাইরের বেণুবন উতলা হয়ে উঠেচে, কিন্তু ঘরের কোণের দীপশিখাটী নববধূর মত শঙ্কিত।

বেণুবন

দখিন হাওয়া, জাগো, জাগো
জাগাও আমার সুপ্ত এ প্রাণ।

আমি বেণু, আমার শাখায়
নীরব যে হায় কতনা গান।
(জাগো জাগো)

দীপশিখা

ধীরে ধীরে ধীরে বও,
ওগো উতল হাওয়া।
নিশীথ রাতের বাঁশি বাজে
শান্ত হও গো, শান্ত হও।

বেণুবন

পথের ধারে আমার কারা।
ওগো পথিক, বাঁধন-হারা,
নৃত্য তোমার চিত্তে আমার
মুক্তি-দোলা করে যে দান॥

দীপশিখা

আমি প্রদীপশিখা তোমার লাগি
ভয়ে ভয়ে একা জাগি,
মনের কথা কানে কানে
মৃদু মৃদু কও॥

বেণুবন

গানের পাখা যখন খুলি
বাধা-বেদন তখন ভুলি।

দীপশিখা

তোমার দূরের গাথা বনের বাণী
ঘরের কোণে দেয় যে আনি ॥

বেণুবন

যখন আমার বুকের মাঝে
তোমার পথের বাঁশি বাজে,
বন্ধ-ভাঙার ছন্দে আমার
মৌন-কাঁদন হয় অবসান ॥
দখিন হাওয়া, জাগো জাগো,
জাগাও আমার সুপ্ত এ প্রাণ ॥

দীপশিখা

আমার কিছু কথা আছে
ভোরের বেলার তারার কাছে ;
সেই কথাটি তোমার কানে
চুপি চুপি লও ॥
ধীরে ধীরে বও,
ওগো উতল হাওয়া ॥

ঋতুরাজের পরিচরবর্গ

সহসা ডালপালা তোর উতলা যে।
(ও চাঁপা, ও করবী)
কারে তুই দেখ্‌তে পেলি
আকাশ-মাঝে
জানিনা যে।

কোন্ সুরের মাতন-হাওয়ায় এসে
বেড়ায় ভেসে,
(ও চাঁপা, ও করবী)
কার নাচনের নূপুর বাজে
জানিনা যে ॥
তোরে ক্ষণে ক্ষণে চমক লাগে।
কোন্ অজানার ধেয়ান যে তোর
মনে জাগে ?
কোন্ রঙের মাতন উঠ্‌লো দুলে
ফুলে ফুলে,
(ও চাঁপা, ও করবী)
কে সাজালে রঙীন সাজে
জানিনা যে ॥

কবি

ঋতুরাজের দূতরা ভাব্‌চে কেউ খবর পায় নি—পায়ের শব্দ শোনা যাচ্চে না, কিন্তু পায়ের শব্দ যে হৃৎকম্পনের মধ্যে ধরা পড়ে।

মাধবী

সে কি ভাবে গোপন র'বে
লুকিয়ে হৃদয়-কাড়া' ?
তাহার আসা হাওয়ায় ঢাকা ;
সে যে সৃষ্টিছাড়া ॥

হিয়ায় হিয়ায় জাগ্‌লো বাণী,
পাতায় পাতায় কানাকানি,
"ঐ এলো যে", "ঐ এলো যে"
পরাণ দিলো সাড়া।
এই তো আমার আপ্‌নারি এই
ফুল-ফোটানোর মাঝে
তারে দেখি নয়ন ভরে'
নানা রঙের সাজে।
এই যে পাখীর গানে গানে
চরণধ্বনি বয়ে' আনে,
বিশ্ববীণার তারে তারে
এইতো দিলো নাড়া॥

রাজা

কবি, ঐতো পূর্ণ চন্দ্র উঠেচে দেখ্‌চি।

কবি

দখিন হাওয়ায় যেন কোন্‌ দেবতার স্বপ্ন ভেসে এলো।

রাজা

শুধু দখিন হাওয়ায় ওকে ভাসালে চল্‌বেনা কবি, তোমার গানের সুরও চাই। জগতে কেবল যে দেবতাই আছেন তা তো নয়।

শালবীথিকা

ভাঙ্‌লো হাসির বাঁধ।
অধীর হয়ে মাত্‌লো কেন
পূর্ণিমার ঐ চাঁদ।

উতল হাওয়া ক্ষণে ক্ষণে
মুকুল-ছাওয়া বকুল-বনে
দোল দিয়ে যায়, পাতায় পাতায়
ঘটায় পরমাদ ॥
ঘুমের আঁচল আকুল হ'লো
কী উল্লাসের ভরে।
স্বপন যত ছড়িয়ে প'লো
দিকে দিগন্তরে।
আজ রাতের এই পাগ্‌লামিরে
বাঁধ্‌বে বলে কে ঐ ফিরে,
শাল বীথিকায় ছায়া গেঁথে
তাই পেতেছে ফাঁদ ॥

বকুল

ও আমার চাঁদের আলো,
আজ ফাগুনের সন্ধ্যাকালে
ধরা দিয়েছো যে আমার
পাতায় পাতায় ডালে ডালে।
যে গান তোমার সুরের ধারায়
বন্যা জাগায় তারায় তারায়,
মোর আঙিনায় বাজ্‌লো সে সুর
আমার প্রাণের তালে তালে ॥

সব কুঁড়ি মোর ফুটে ওঠে
তোমার হাসির ইসারাতে।
দখিন হাওয়া দিশাহারা
আমার ফুলের গন্ধে মাতে।
শুভ্র, তুমি ক'র্‌লে বিলোল
আমার প্রাণে রঙের হিলোল,
মর্ম্মরিত মর্ম্ম আমার
জড়ায় তোমার হাসির জালে॥

রাজা

সব তো বুঝ্‌লুম্‌। আকাশ থেকে চাঁদ দেখ্‌চি পৃথিবীর হৃদয়কে দোলা লাগিয়েছে। কিন্তু ওঁকে পৃথিবীতে নামিয়ে এনে কষে *দোলা না দিতে* পার্‌লে তো জবাব দেওয়া হয় না। তার কি কর্‌লে?

কবি

তার তো ব্যবস্থা হয়েচে মহারাজ। আমাদের নদীর ঢেউ আছে তো, সেদিকে চেয়ে দেখ না। চাঁদ টলোমলো।

নদী

কে দেবে চাঁদ তোমায় দোলা?
আপন আলোর স্বপন মাঝে বিভোল-ভোলা॥
কেবল তোমার চোখের চাওয়ায়
দোলা দিলে হাওয়ায় হাওয়ায়
বনে বনে দোল জাগালো
ঐ চাহনি তুফান-তোলা॥

আজ মানসের সরোবরে
কোন্ মাধুরীর কমল-কানন
দোলাও তুমি ঢেউয়ের পরে।
তোমার হাসির আভাস লেগে
বিশ্ব-দোলন দোলার বেগে
উঠ্‌লো জেগে আমার গানের
কল্লোলিনী কলরোলা॥

রাজা

এবার ঐ কে আসে?

কবি

ব'ল্‌বো না। চিন্‌তে পারেন কি না দেখ্‌তে চাই।

দখিন হাওয়া

শুক্‌নো পাতা কে যে ছড়ায় ঐ দূরে
উদাস-করা কোন্ সুরে॥
ঘর-ছাড়া ঐ কে বৈরাগী
জানি না যে কাহার লাগি
ক্ষণে ক্ষণে শূন্য বনে যায় ঘুরে॥
চিনি চিনি হেন ওরে হয় মনে,
ফিরে ফিরে যেন দেখা ওর সনে।
ছদ্মবেশে কেন খেলো,
জীর্ণ এ বাস ফেলো ফেলো,
প্রকাশ করো চিরনূতন বন্ধুরে॥

রাজা

ওহে কবি তোমার এ পালাটা কী রকম করে তুলেচো? বরযাত্রীরই ভিড়, বর কোথায়? তোমার ঋতুরাজ কই?

কবি

ঐ যে এইখানিক আগে দেখ্‌লেন।

রাজা

ঐ জীর্ণ বসন পরে শুক্‌নো পাতা ছড়িয়ে বেড়াচ্চে? ওতে তো নবীনের রূপ দেখ্‌লুম না। ও তো মূর্ত্তিমান পুরাতন।

কবি

তবে তো চিন্‌তে পারেন নি, ঠকেচেন। আমাদের ঋতুরাজের যে গায়ের কাপড়খানা আছে, তার এক পিঠে নূতন, একপিঠে পুরাতন। যখন উল্টে পরেন তখন দেখি শুক্‌নো পাতা, ঝরা ফুল, আবার যখন পাল্টে নেন তখন সকাল বেলার মল্লিকা, সন্ধ্যাবেলার মালতী,—তখন ফাল্গুনের আম্র-মঞ্জরী, চৈত্রের কনকচাঁপা। উনি একই মানুষ নূতন পুরাতনের মধ্যে লুকোচুরি করে বেড়াচ্চেন।

রাজা

তা হ'লে নবীন মূর্ত্তিটা একবার দেখিয়ে দাও! আর দেরি কেন?

কবি

ঐ যে এসেছেন। পথিক বেশে, নূতন পুরাতনের মাঝখানকার নিত্য-যাতায়াতের পথে।

রাজা

তোমার পলাতকা বুঝি পথে পথেই থাকেন?

কবি

হাঁ, উনি বাস্তুছাড়ার দলপতি, আমি ওঁরই গানের তল্‌পি বয়ে বেড়াই।

রাজা

আর দেরি নয়, কবি। ঐ দেখ, মন্ত্রণাসভা থেকে অর্থসচিব এসেচে। রাজকোষের কথা পাড়্‌বার পূর্ব্বেই ঋতুরাজের আসর জমাও।

মাধবী মালতী ইত্যাদি

তোমার বাস কোথা যে, পথিক, ওগো
দেশে কি বিদেশে?
তুমি হৃদয়-পূর্ণ-করা, ওগো
তুমিই সর্ব্বনেশে।

ঋতুরাজ

আমার বাস কোথা যে জান না কি
শুধাতে হয় সে কথা কি,
ও মাধবী, ও মালতী?

মাধবী মালতী ইত্যাদি

হয়তো জানি, হয়তো জানি, হয়তো জানিনে,
মোদের বলে দেবে কে সে?
মনে করি আমার তুমি,
বুঝি নও আমার।
বলো, বলো, বলো, পথিক,
বলো তুমি কার?

ঋতুরাজ

আমি তারি যে আমারে
যেম্‌নি দেখে চিন্‌তে পারে
ও মাধবী, ও মালতী!

মাধবী মালতী ইত্যাদি

হয়তো চিনি, হয়তো চিনি, হয়তো চিনিনে,
মোদের বলে দেবে কে সে!

বনপথ

আজ দখিন বাতাসে
নাম-না-জানা কোন্ বনফুল
ফুট্‌লো বনের ঘাসে॥

ঋতুরাজ

ও মোর পথের সাথী, পথে পথে
গোপনে যায় আসে॥

বনপথ

কৃষ্ণচূড়া চূড়ায় সাজে,
বকুল তোমার মালার মাঝে,
শিরীষ তোমার ভ'র্‌বে সাজি
ফুটেছে সেই আশে॥

ঋতুরাজ

এ মোর পথের বাঁশির সুরে সুরে
লুকিয়ে কাঁদে হাসে।

বনপথ

ওরে দেখ বা নাই দেখ, ওরে
যাও বা না যাও ভুলে।

ওরে নাই বা দিলে দোলা, ওরে
নাই বা নিলে তুলে।
সভায় তোমার ও কেহ নয়,
ওর সাথে নেই ঘরের প্রণয়,
যাওয়া-আসার আভাস নিয়ে
রয়েছে এক পাশে॥

ঋতুরাজ

ওগো ওর সাথে মোর প্রাণের কথা
নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে॥

রাজা

খুব জমেচে কবি। সুরের দোলায় চাঁদকে দুলিয়েচ। ঐ দেখ না আমার অর্থসচিব সুদ্ধ দুল্‌চে।

কবি

এবার সময় হয়েচে।

রাজা

কিসের সময়?

কবি

ঋতুরাজের যাবার সময়।

রাজা

আমাদের অর্থসচিবকে চোখে পড়েচে না কি?

কবি

বলেইচি পূর্ণ থেকে রিক্ত, রিক্ত থেকে পূর্ণ, এরই মধ্যে ওঁর [illegible] বাঁধন পরা, বাঁধন খোলা,—এও যেমন এক খেলা, ওও তেমনি এক খেলা।

রাজা

আমি কিন্তু ঐ পূর্ণ হওয়ার খেলাটাই পছন্দ করি।

কবি

যথার্থ পূর্ণ হয়ে উঠ্‌লে রিক্ত হওয়ার খেলায় ভয় থাকে না।

রাজা

বোধ হচ্চে যেন এখনি উপদেশ দিতে সুরু ক'র্‌বে।

কবি

আচ্ছা তা হ'লে আবার গান সুরু হোক্‌!

ঋতুরাজ

এখন আমার সময় হ'লো,
যাবার দুয়ার খোলো খোলো ॥
হ'লো দেখা, হ'লো মেলা,
আলো ছায়ায় হ'লো খেলা,
স্বপন যে সে ভোলো ভোলো ॥
আকাশ ভ'রে দূরের গানে,
অলখ দেশে হৃদয় টানে।
ওগো সুদূর, ওগো মধুর,
পথ বলে দাও পরাণ-বঁধুর,
সব আবরণ তোলো, তোলো ॥

মাধবী

বিদায় যখন চাইবে তুমি দক্ষিণ সমীরে,
তোমায় ডাক্‌বো না তো ফিরে ॥

ক'র্‌বো তোমায় কী সম্ভাষণ ?
কোথায় তোমার পাত্‌বো আসন
পাতা-ঝরা কুসুম-ঝরা নিকুঞ্জ-কুটীরে ॥
তুমি আপনি যখন আসো তখন
আপনি করো ঠাঁই,
আপনি কুসুম ফোটাও, মোরা
তাই দিয়ে সাজাই।
তুমি যখন যাও, চলে যাও,
সব আয়োজন হয় যে উধাও,
গান ঘুচে যায়, রং মুছে যায়
তাকাই অশ্রুনীরে ॥

ঋতুরাজ

এবেলা ডাক্ পড়েছে কোন্ খানে
ফাগুনের ক্লান্তক্ষণের শেষ গানে ॥
সেখানে স্তব্ধবীণার তারে তারে,
সুরের খেলা ডুব-সাঁতারে,
সেখানে চোখ মেলে যার পাইনে দেখা
তাহারে মন জানে গো মন জানে ॥
এবেলা মন যেতে চায় কোন্ খানে
নিরালায় লুপ্ত পথের সন্ধানে।

সেখানে মিলন-দিনের ভোলা-হাসি
লুকিয়ে বাজায় করুণ বাঁশি,
সেখানে যে কথাটি হয় না বলা
সে কথা রয় কানে গো, রয় কানে ॥

ঝুম্‌কোলতা

না, যেয়ো না, যেয়ো নাকো।
মিলন-পিয়াসী মোরা,
কথা রাখো, কথা রাখো।
আজো বকুল আপনহারা, হায়রে,
ফুল-ফোটানো হয় নি সারা,
সাজি ভরে নি,
পথিক, ওগো থাকো থাকো ॥
চাঁদের চোখে জাগে নেশা,
তার আলো, গানে গন্ধে মেশা।
দেখো চেয়ে কোন্‌ বেদনায়, হায়রে,
মল্লিকা ঐ যায় চলে যায়
অভিমানিনী।
পথিক, তারে ডাকো ডাকো ॥

আকন্দ

এবার বিদায় বেলার সুর ধরো ধরো
তোমার শেষ ফুলে আজ সাজি ভরো ॥

যাবার পথে আকাশ-তলে
মেঘ রাঙা হ'লো চোখের জলে,
ঝরে পাতা ঝর-ঝর ॥
হেরো হেরো ঐ রুদ্র রবি
স্বপ্ন ভাঙায় রক্ত ছবি।
খেয়া তরীর রাঙা পালে
আজ লাগ্‌লো হাওয়া ঝড়ের তালে
বেণুবনের ব্যাকুল শাখা থর-থর ॥

ধুতুরা

আজ খেলা-ভাঙার খেলা খেল্‌বি আয়।
সুখের বাসা ভেঙে ফেল্‌বি আয়!
মিলন-মালার আজ বাঁধন তো টুট্‌বে,
ফাগুন-দিনের আজ স্বপন তো ছুট্‌বে,
উধাও মনের পাখা মেল্‌বি আয়।
অস্ত গিরির ঐ শিখর-চূড়ে
ঝড়ের মেঘের আজ ধ্বজা উড়ে।
কাল-বৈশাখীর হবে যে নাচন,
সাথে নাচুক্ তোর মরণ-বাঁচন,
হাসি-কাঁদন পায়ে ঠেল্‌বি আয় ॥

জবা

ভয় ক'র্‌বো না রে
বিদায় বেদনারে।

আপন সুধা দিয়ে
ভরে দেবো তারে ॥
চোখের জলে সে যে নবীন র'বে,
ধ্যানের মণিমালায় গাঁথা হ'বে,
প'রবো বুকের হারে ॥
নয়ন হ'তে তুমি আস্‌বে প্রাণে,
মিল্‌বে তোমার বাণী আমার গানে।
বিরহ-ব্যথায় বিধুরদিনে
দুখের আলোয় তোমায় নেবো চিনে
এ মোর সাধনারে ॥

সকলে

ওরে পথিক, ওরে প্রেমিক,
বিচ্ছেদে তোর খণ্ড-মিলন পূর্ণ হবে।
আয়রে সবে
প্রলয়-গানের মহোৎসবে।
তাণ্ডবে ঐ তপ্ত-হাওয়ায় ঘূর্ণী লাগায়,
মত্ত ঈশান বাজায় বিষাণ শঙ্কা জাগায়,
ঝঙ্কারিয়া উঠ্‌লো আকাশ ঝঞ্ঝারবে
আয়রে সবে
প্রলয়-গানের মহোৎসবে।

রাজা

আমার মন্ত্রণাসভার ক'র্‌লে কি? সব মন্ত্রী যে এখানে এসে জুটেছে। ঐ দেখ আমার অর্থসচিবসুদ্ধ যে নাচ্‌তে সুরু করে দিলে। বড় লঘু হ'য়ে পড়্‌চেন না?

কবি

ওঁর যে থলি শূন্য হয়ে গেছে, তাই নাচে টেনেচে। বোঝা ভারি থাক্‌লে গৌরবে নড়্‌তে পার্‌তেন না। আজ আমাদের অগৌরবের উৎসব।

রাজা

রাজগৌরব?

কবি

সেও টিঁক্‌লো না। তাই তো ঋতুরাজ আজ রাজবেশ খসিয়ে দিয়ে বৈরাগী হয়ে বেরিয়ে চলেচে। এবার ধরণীতে তপস্যার দিন এসেচে, অর্থসচিবদের হাতে কাজ থাক্‌বে না।

ভাঙন-ধরার ছিন্ন-করার রুদ্র নাটে
যখন সকল ছন্দ-বিকল বন্ধ কাটে,
মুক্তি-পাগল বৈরাগীদের চিত্ততলে
প্রেম-সাধনার হোম-হুতাশন জ্বল্‌বে তবে।
ওরে পথিক, ওরে প্রেমিক,
সব আশা-জাল যায়রে যখন উড়ে পুড়ে
আশার অতীত দাঁড়ায় তখন ভুবন জুড়ে,
স্তব্ধ-বাণী নীরব-সুরে কথা ক'বে॥
আয়রে সবে
প্রলয়-গানের মহোৎসবে॥

——:০:——

সুন্দর।

১

হাটের ধূলা সয়না যে আর কাতর করে প্রাণ।
তোমার সুর-সুরধুনীর ধারায় করাও আমায় স্নান।
জাগাক্ তারি মৃদঙ্গ-রোল,
রক্তে তুলুক্ তরঙ্গ-দোল,
অঙ্গ হতে ফেলুক্ ধুয়ে সকল অসম্মান,
সব কোলাহল দিক্ ডুবায়ে তাহার কলতান।
সুন্দর হে, তোমার ফুলে গেঁথেছিলেম মালা,
সেই কথা আজ মনে করাও ভুলাও সকল জ্বালা।
তোমার গানের পদ্মবনে
আবার ডাকো নিমন্ত্রণে,
তারি গোপন সুধাকণা আবার করাও পান,
তারি রেণুর তিলক-লেখা আমায় করো দান॥

২

বারে বারে পেয়েছি যে তারে—
চেনায় চেনায় অচেনারে।
যারে দেখা গেলো, তারি মাঝে
না-দেখারি কোন্ বাঁশি বাজে,
যে আছে বুকের কাছে কাছে
চলেছি তাহারি অভিসারে॥

অপরূপ সে যে রূপে রূপে
কি খেলা খেলিছে চুপে চুপে।
কানে কানে কথা উঠে পূরে
কোন্ সুদূরের সুরেসুরে,
চোখে চোখে চাওয়া নিয়ে চলে
কোন্ অজানারি পথপারে ॥

৩

কবে তুমি আস্‌বে বলে রইবো না ব'সে,
আমি চল্‌বো বাহিরে।
শুক্‌নো ফুলের পাতাগুলি প'ড়্‌তেছে খ'সে,
আর সময় নাহি রে ॥
ওরে বাতাস দিলো দোল, দিলো দোল।
এবার ঘাটের বাঁধন খোল্, ও তুই খোল্।
মাঝ-নদীতে ভাসিয়ে দিয়ে তরী বাহি রে ॥
আজ শুক্লা একাদশী,
হের নিদ্রাহারা শশী,
ঐ স্বপ্ন-পারাবারের খেয়া একলা চালায় বসি'।
তোর পথ জানা নাই, নাইবা জানা নাই,
তোর নাই মানা নাই, মনের মানা নাই ;
সবার সাথে চল্‌বি রাতে সাম্‌নে চাহি রে ॥

৪

আজ কি তাহার বারতা পেলরে কিশলয় ?
ওরা   কার কথা কয় বন-ময় ?
আকাশে আকাশে দূরে দূরে
সুরে সুরে
কোন্ পথিকের গাহে জয় ?
যেথা চাঁপা-কোরকের শিখা জ্বলে
ঝিল্লি-মুখর ঘন-বনতলে,
এসো কবি, এসো, মালা পরো
বাঁশি ধরো,
হোক্ গানে গানে বিনিময় ॥

৫

তোমায় চেয়ে আছি ব'সে পথের ধারে,
সুন্দর হে ।
জ'মলো ধূলা প্রাণের বীণার তারে তারে,
সুন্দর হে ॥
নাই যে কুসুম, মালা গাঁথ্‌বো কিসে,
কান্নার গান বীণায় এনেছি সে,
দূর হ'তে তাই শুন্‌তে পাবে অন্ধকারে
সুন্দর হে ॥
দিনের পরে দিন কেটে যায় সুন্দর হে ।
মরে হৃদয় কোন্ পিপাসায় সুন্দর হে ।

শূন্য ঘাটে আমি কী যে করি,
রঙীন্ পালে কবে আস্‌বে তরী.
পাড়ি দেবো কবে সুধা-রসের পারাবারে,
সুন্দর হে ॥

৬

আমার দোসর যে জন, ওগো তারে কে জানে।
একতারা তার দেয় কি সাড়া
আমার গানে, কে জানে ॥
আমার নদীর যে ঢেউ,
ওগো জানে কি কেউ,
যায় বহে যায় কাহার পানে, কে জানে ॥
যখন বকুল ঝরে
আমার কানন-তল যায় গো ভ'রে,
তখন কে আসে যায়
সেই বন-ছায়ায়,
কে সাজি তার ভ'রে আনে, কে জানে ॥

৭

নাই যদি বা এলে তুমি, এড়িয়ে যাবে তাই ব'লে ?
অন্তরেতে নাই কি তুমি, সাম্‌নে আমার নাই ব'লে ?
মন যে আছে তোমায় মিশে,
আমায় তবে ছাড়্‌বে কিসে ?
প্রেম কি আমার হারায় দিশে, অভিমানে যাই বলে ॥

বিরহ মোর হোক্‌না অকূল, সেই বিরহের সরোবরে
মিলন-কমল উঠ্‌চে দুলে অশ্রুজলের ঢেউয়ের পরে।
তবু তৃষায় মরে আঁখি,
তোমার লাগি চেয়ে থাকি,
চোখের পরে পাবো নাকি, বুকের পরে পাই ব'লে॥

৮

ফিরে ফিরে ডাক্‌ দেখিরে পরাণ খুলে,
দেখ্‌বো কেমন রয় সে ভুলে॥
সে ডাক বেড়াক্‌ বনে বনে,
সে ডাক শুধাক্‌ জনে জনে
সে ডাক বুকে দুঃখে সুখে ফিরুক্‌ দুলে॥
সাঁঝ সকালে রাত্রি বেলায় ক্ষণে ক্ষণে,
একলা ব'সে ডাক্‌ দেখি তায় মনে মনে।
নয়ন তোরি ডাকুক্‌ তারে,
শ্রবণ রহুক্‌ পথের ধারে,
থাক্‌না সে ডাক গলায় গাঁথা মালার ফুলে॥

৯

আমার মনের কোণের বাইরে
জান্‌লা খুলে ক্ষণে ক্ষণে চাইরে॥

অনেক দূরে
উদাস সুরে
আভাস যে কার পাইরে,
আছে আছে নাইরে॥
দুই আঁখি হয় হারা
কোন্ গগনে খোঁজে সে কোন্ সন্ধ্যাতারা।
কার ছায়া আমায়
ছুঁয়ে যে যায়,
কাঁপে হৃদয় তাইরে,
গুন্ গুনিয়ে গাইরে॥

১০

ফাগুন হাওয়ায় রঙে রঙে পাগল ঝোরা লুকিয়ে ঝরে,
গোলাপ-জবা-পারুল-পলাশ-পারিজাতের বুকের পরে॥
সেই খানে মোর পরাণখানি
যখন পারি ব'হে আনি,
নিলাজ রাঙা মাতাল রঙে রঙিয়ে নিতে থরে থরে॥
বাহির হ'লেম ব্যাকুল হাওয়ার উধাও পথের চিহ্ন ধ'রে,
ওগো তুমি রঙে বিভোর, ধ'র্‌বো তোমায় কেমন ক'রে?
কোন্ আড়ালে লুকিয়ে রবে?
তোমায় যদি না পাই তবে
রক্তে আমার তোমার পায়ের রঙ্ লেগেছে কিসের তরে॥

১১

জাগরণে যায় বিভাবরী ;
আঁখি হ'তে ঘুম নিলো হরি'
মরি মরি ॥
যার লাগি' ফিরি একা একা,
আঁখি পিপাসিত, নাহি দেখা,
তারি বাঁশী, ওগো তারি বাঁশী—
তারি বাঁশী বাজে হিয়া ভরি'
মরি মরি ॥
বাণী নাহি, তবু কানে কানে
কী যে শুনি তাহা কেবা জানে।
এই হিয়া-ভরা বেদনাতে,
বারি-ছলছল আঁখিপাতে
ছায়া দোলে, তারি ছায়া দোলে—
ছায়া দোলে দিবানিশি ধরি
মরি মরি ॥

১২

সে যে বাহির হ'লো আমি জানি।
বক্ষে আমার বাজে তাহার পথের বাণী।
কোথায় কবে এসেছে সে
সাগরতীরে বনের শেষে,
আকাশ করে সেই কথারই কানাকানি ॥

হায়রে আমি ঘর বেঁধেছি এতই দূরে,
না জানি তার আস্‌তে হবে কত ঘুরে।
হিয়া আমার পেতে রেখে
সারাটি পথ দিলেম ঢেকে,
আমার ব্যথায় পড়ুক্‌ তাহার চরণখানি ॥

১৩

রাতে রাতে আলোর শিখা রাখি জ্বেলে
ঘরের কোণে আসন মেলে।
বুঝি সময় হ'লো এবার
আমার প্রদীপ নিবিয়ে দেবার
পূর্ণিমা-চাঁদ তুমি এলে ॥
এতদিন সে ছিলো তোমার পথের পাশে
তোমার দরশনের আশে।
আজ তারে যেই পরশিবে
যাক্‌ সে নিবে, যাক্‌ সে নিবে,
যা আছে সব দিক্‌ সে ঢেলে ॥

১৪

এ কী মায়া, লুকাও কায়া জীর্ণ শীতের সাজে?
আমার সয়না প্রাণে, কিছুতে সয়না যে ॥
কৃপণ হয়ে হে মহারাজ,
রইবে কি আজ
আপন ভুবন-মাঝে ॥

বুঝ্‌তে নারি বনের বীণা
তোমার প্রসাদ পাবে কিনা ?
হিমের হাওয়ায় গগন-ভরা ব্যাকুল রোদন বাজে ॥
কেন মরুর পারে কাটাও বেলা রসের কাণ্ডারী ?
লুকিয়ে আছে কোথায় তোমার রূপের ভাণ্ডারী।
রিক্ত-পাতা শুষ্ক শাখে
কোকিল তোমার কই গো ডাকে,
শূন্য সভা, মৌন বাণী; আমরা মরি লাজে ॥

১৫

ভাঙ্‌বো, তাপস, ভাঙ্‌বো তোমার কঠিন তপের বাঁধন,
এই আমাদের সাধন ॥
চল্ কবি চল্ সঙ্গে জুটে,
কাজ ফেলে তুই আয়রে ছুটে,
গানে গানে উদাস প্রাণে, জাগারে উন্মাদন ॥
বকুল বনে মুগ্ধ হৃদয় উঠুক্ না উচ্ছ্বাসি';
নীলাম্বরের মর্ম্মমাঝে বাজাও সোনার বাঁশি।
পলাশ-রেণুর রঙ মাখিয়ে
নবীন বসন এনেছি এ,
সবাই মিলে দিই ঘুচিয়ে পুরাণো আচ্ছাদন ॥

১৬

ওহে সুন্দর, মরি মরি!
তোমায় কী দিয়ে বরণ করি ॥

তব ফাল্গুন যেন আসে
আজি মোর পরাণের পাশে,
দেয় সুধারস ধারে ধারে
মম অঞ্জলি ভরি' ভরি' ॥
মধু সমীর দিগঞ্চলে
আনে পুলক-পূজাঞ্জলি,
মম হৃদয়ের পথ-তলে
যেন চঞ্চল আসে চলি'।
মম মনের বনের শাখে
যেন নিখিল কোকিল ডাকে,
যেন মঞ্জরী-দীপ-শিখা
নীল অম্বরে রাখে ধরি' ॥

১৭

কতো যে তুমি মনোহর, মনই তাহা জানে ;
হৃদয় মম থরথর কাঁপে তোমার গানে ॥
আজিকে এই প্রভাত বেলা
মেঘের সাথে রোদের খেলা,
জলে নয়ন ভরভর চাহি' তোমার পানে ॥
আলোর অধীর ঝিলিমিলি নদীর ঢেউয়ে ওঠে,
বনের হাসি খিলিখিলি পাতায় পাতায় ছোটে।

আকাশে ওই দেখি কী যে,
তোমার চোখের চাহনি যে,
সুনীল সুধা ঝরঝর ঝরে আমার প্রাণে ॥

১৮

ছিলো যে পরাণের অন্ধকারে
এলো সে ভুবনের আলোক-পারে ॥
স্বপন-বাধা টুটি'
বাহিরে এলো ছুটি',
অবাক আঁখি দু'টি
হেরিলো তারে ॥
মালাটি গেঁথেছিনু অশ্রুধারে,
তারে যে বেঁধেছিনু সে মায়া-হারে।
নীরব বেদনায়
পূজিনু যারে হায়,
নিখিল তারি গায়
বন্দনা রে ॥

১৯

মন চেয়ে রয়, মনে মনে হেরে মাধুরী।
চোখ দু'টো তাই কাঙাল হয়ে মরে না ঘুরি ॥

চেয়ে চেয়ে, বুকের মাঝে
গুঞ্জরিলো একতারা যে,
মনোরথের পথে পথে বাজ্‌লো বাঁশুরি ;
রূপের কোলে ঐ যে দোলে অরূপ মাধুরী ॥
কূলহারা কোন্ রসের সরোবরে
মূলহারা ফুল ভাসে জলের পরে।
হাতের ধরা ধর্‌তে গেলে
ঢেউ দিয়ে তায় দিই যে ঠেলে,
আপন মনে স্থির হ'য়ে রই করিনে চুরি ;
ধরা দেওয়ার ধন সে ত নয় অরূপ মাধুরী ॥

২০

লহ লহ, তুলে লহ নীরব বীণাখানি।
নন্দন-নিকুঞ্জ হ'তে সুর দেহ তায় আনি,
ওহে সুন্দর, হে সুন্দর ॥
আঁধার বিছায়ে আছি রাতের আকাশে
তোমারি আশ্বাসে,
তারায় তারায় জাগাও তোমার আলোকভরা বাণী,
ওহে সুন্দর, হে সুন্দর ॥
পাষাণ আমার কঠিন দুঃখে তোমায় কেঁদে বলে,
পরশ দিয়ে সরস করো ভাসাও অশ্রুজলে,
ওহে সুন্দর, হে সুন্দর ॥

শুষ্ক যে এই নগ্ন মরু নিত্য মরে লাজে
আমার চিত্ত মাঝে,
শ্যামল রসের আঁচল তাহার বক্ষে দেহ টানি',
ওহে সুন্দর, হে সুন্দর ॥

২১

ওকি এলো, ওকি এলো না,
বোঝা গেলো না।
ওকি মায়া, কি স্বপন-ছায়া,
ওকি ছলনা ॥
ধরা কি পড়ে ও রূপেরি ডোরে,
গানেরি তানে কি বাঁধিবে ওরে,
ও যে চির বিরহেরি সাধনা ॥
ওর বাঁশিতে করুণ কী সুর লাগে
বিরহ-মিলন-মিলিত রাগে।
সুখে কি দুখে ও পাওয়া-না-পাওয়া,
হৃদয়-বনে ও উদাসী-হাওয়া,
বুঝি শুধু ও পরম-কামনা ॥

২২

কুসুমে কুসুমে চরণ-চিহ্ন দিয়ে যাও, শেষে দাও মুছে।
ওহে চঞ্চল, বেলা নাহি যেতে খেলা কেন তব যায় ঘুচে ॥
চকিত চোখের অশ্রু-সজল
বেদনায় তুমি ছুঁয়ে ছুঁয়ে চল ;

কোথা সে পথের শেষ,
কোন্ সুদূরের দেশ,
সবাই তোমায় তাই পুছে ॥
বাঁশরীর ডাকে কুঁড়ি ধরে শাখে, ফুল যবে ফোটে নাই দেখা,
তোমার লগন যায় যে কখন, মালা গেঁথে আমি রই একা।
এসো এসো এসো, আঁখি কয় কেঁদে,
তৃষিত বক্ষ বলে, রাখি বেঁধে ;
যেতে যেতে ওগো প্রিয়,
কিছু ফেলে রেখে দিয়ো,
ধরা দিতে যদি নাই রুচে ॥

২৩

ও দেখা দিয়ে যে চলে গেলো,
ও চুপি চুপি কী বলে গেলো,
ও যেতে যেতে গো কাননেতে গো
ফুলেরা ওরি কোলে গেলো ॥
মনে মনে কী ভাবে কে জানে,
মেতে আছে ও যেন কী গানে,
নয়ন হানে আকাশ পানে
চাঁদের হিয়া গ'লে গেলো ॥
ও পায়ে পায়ে যে বাজায়ে চলে
বীণার ধ্বনি তৃণের দলে।

কে জানে কারে ভালো কি বাসে,
বুঝিতে নারি কাঁদে কি হাসে,
জানিনে ও কি ফিরিয়া আসে,
জানিনে ও কি ছ'লে গেলো ॥

২৪

যে কেবল পালিয়ে বেড়ায়, দৃষ্টি এড়ায়
ডাক দিয়ে যায় ইঙ্গিতে,
সে কি আজ দিলো ধরা গন্ধে ভরা
বসন্তের এই সঙ্গীতে ॥
ওকি তার উত্তরীয় অশোক শাখায় উঠ্‌লো দুলি',
আজি কি পলাশ বনে ঐ সে বুলায় রঙের তুলি,
ওকি তার চরণ পড়ে তালে তালে
মল্লিকার ঐ ভঙ্গীতে ॥
না গো না দেয়নি ধরা, হাসির ভরা
দীর্ঘশ্বাসে যায় ভেসে।
মিছে এই হেলা-দোলায় মনকে ভোলায়
ঢেউ দিয়ে যায় স্বপ্নে সে।
সে বুঝি লুকিয়ে আসে বিচ্ছেদেরি রিক্তরাতে,
নয়নের আড়ালে তার নিত্যজাগার আসন পাতে,
ধেয়ানের বর্ণছটায় ব্যথার রঙে
মনকে সে রয় রঙ্গিতে ॥

——:০:——

ফাল্গুনী

—o—

সূচনা

দৃশ্য—রাজোদ্যান

চুপ, চুপ, চুপ কর্ তোরা।

কেন, কি হয়েচে?

মহারাজের মন খারাপ হয়েচে।

সর্ব্বনাশ!

কেরে? কে বাজায় বাঁশি?

কেন ভাই, কী হয়েচে?

মহারাজের মন খারাপ হয়েচে।

সর্ব্বনাশ!

ছেলেগুলো দাপাদাপি ক'র্চে কা'র?

আমাদের মণ্ডলদের।

মণ্ডলকে সাবধান ক'রে দে। ছেলেগুলোকে ঠেকাক্!

মন্ত্রী কোথায় গেলেন?

এই যে এখানেই আছি।

খবর পেয়েছেন কি?

কী বলো দেখি!

মহারাজের মন খারাপ হয়েচে।

প্রত্যন্তবিভাগ থেকে যুদ্ধের সংবাদ এসেচে যে!

যুদ্ধ চলুক্ কিন্তু তার সংবাদটা এখন চল্‌বে না।

চীন-সম্রাটের দূত অপেক্ষা ক'রচেন।

অপেক্ষা ক'রতে দোষ নেই, কিন্তু সাক্ষাৎ পাবেন না।

ঐ যে মহারাজ আস্‌চেন।

জয় হোক্ মহারাজের।

মহারাজ, সভায় যাবার সময় হ'লো।

যাবার সময় হ'লো বৈ কি, কিন্তু সভায় যাবার নয়।

সে কি কথা, মহারাজ ?

সভা ভাঙ্‌বার ঘণ্টা বেজেচে শুন্‌তে পেয়েচি।

কই, আমরা তো কেউ—

তোমরা শুন্‌বে কী ক'রে ? ঘণ্টা একেবারে আমারই কানের কাছে বাজিয়েচে।

এত বড়ো স্পর্দ্ধা কা'র হ'তে পারে ?

মন্ত্রী, এখনো বাজাচ্ছে।

মহারাজ, দাসের স্থূলবুদ্ধি মাপ ক'রবেন, বুঝ্‌তে পার্‌লুম না।

এই চেয়ে দেখো—

মহারাজের চুল—

ওখানে একজন ঘণ্টা-বাজিয়েকে দেখ্‌তে পাচ্চ না ?

দাসের সঙ্গে পরিহাস ?

পরিহাস আমার নয়, মন্ত্রী, যিনি পৃথিবীসুদ্ধ জীবের কানে ধ'রে পরিহাস করেন, এ তাঁরই। গত রজনীতে আমার গলায় মল্লিকার মালা পরাবার সময় মহিষী চম্‌কে উঠে ব'ল্লেন, এ কি মহারাজ, আপনার কানের কাছে দু'টো পাকাচুল দেখ্‌চি যে।

মহারাজ, এজন্য খেদ ক'রবেন না—রাজবৈদ্য আছেন তিনি—

এ বংশের প্রথম রাজা ইক্ষ্বাকুরও রাজবৈদ্য ছিলেন, তিনি কী ক'রতে পেরেছিলেন ?—মন্ত্রী, যমরাজ আমার কানের কাছে তাঁর নিমন্ত্রণপত্র

ঝুলিয়ে রেখে দিয়েচেন। মহিষী এ দু'টো চুল তুলে' ফেল্‌তে চেয়েছিলেন, আমি বল্লুম, কি হবে রাণী? যমের পত্রই যেন সরালুম কিন্তু যমের পত্রলিখককে তো সরানো যায় না। অতএব এ পত্র শিরোধার্য্য করাই গেলো।—এখন তাহ'লে—

যে আজ্ঞা, এখন তাহ'লে রাজকার্য্যের আয়োজন—

কিসের রাজকার্য্য? রাজকার্য্যের সময় নেই—শ্রুতিভূষণকে ডেকে আনো।

সেনাপতি বিজয়বর্ম্মা—

না, বিজয়বর্ম্মা না, শ্রুতিভূষণ।

মহারাজ, এদিকে চীন-সম্রাটের দূত—

তাঁর চেয়ে বড়ো সম্রাটের দূত অপেক্ষা ক'র্‌চেন। ডাকো শ্রুতিভূষণকে।

মহারাজ, প্রত্যন্তসীমার সংবাদ—

মন্ত্রী, প্রত্যন্ততম সীমার সংবাদ এসেচে, ডাকো শ্রুতিভূষণকে।

মহারাজের শ্বশুর—

আমি যাঁর কথা বল্‌চি তিনি আমার শ্বশুর নন্। ডাকো শ্রুতিভূষণকে।

আমাদের কবিশেখর তাঁর কল্পমঞ্জরী কাব্য নিয়ে—

নিয়ে তিনি তাঁর কল্পদ্রুমের শাখায় প্রশাখায় আনন্দে সঞ্চরণ করুন, ডাকো শ্রুতিভূষণকে।

যে আদেশ, তাঁকে ডাকৃতে পাঠাচ্চি।

বোলো, সঙ্গে যেন তাঁর বৈরাগ্যবারিধি পুঁথিটা আনেন।

প্রতিহারী, বাইরে ঐ কা'রা গোল ক'র্‌চে, বারণ করো, আমি একটু শান্তি চাই।

নাগপত্তনে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে, প্রজারা সাক্ষাৎ প্রার্থনা করে।

আমার তো সময় নেই মন্ত্রী, আমি শান্তি চাই।

তা'রা ব'ল্‌চে তাদের সময় আরো অনেক অল্প—তা'রা মৃত্যুর দ্বার প্রায় লঙ্ঘন করেচে—তা'রা ক্ষুধাশান্তি চায়।

ক্ষুধাশান্তি! এ সংসারে কি ক্ষুধার শান্তি আছে? ক্ষুধানলের শান্তি চিতানলে।

তাহ'লে মহারাজ, ঐ হতভাগ্যদের—

ঐ হতভাগ্যদের প্রতি এই হতভাগ্যের উপদেশ এই যে, কাল-ধীবরের জাল ছিন্ন ক'র্‌বার জন্যে ছট্‌ফট্‌ করা বৃথা, আজই হোক্‌ কালই হোক্‌ সে টেনে তুল্‌বেই।

অতএব—

অতএব শ্রুতিভূষণকে প্রয়োজন এবং তাঁর বৈরাগ্যবারিধি পুঁথি।

প্রজারা তাহ'লে দুর্ভিক্ষ—

দেখো মন্ত্রী, ভিক্ষা তো অন্নের নয়, ভিক্ষা আয়ুর। সেই ভিক্ষায় জগৎ জুড়ে দুর্ভিক্ষ—কী রাজার কী প্রজার—কে কা'কে রক্ষা ক'র্‌বে?

অতএব—

অতএব শ্মশানেশ্বর শিব যেখানে ডমরুধ্বনি ক'র্‌চেন সেইখানেই সকলের সব প্রার্থনা ছাইচাপা প'ড়্‌বে—তবে কেন মিছে গলা ভাঙা! এই যে শ্রুতিভূষণ, প্রণাম!

শুভমস্তু!

শ্রুতিভূষণ মশায়, মহারাজকে একটু বুঝিয়ে ব'ল্‌বেন যে অবসাদগ্রস্ত নিরুৎসাহকে লক্ষ্মী পরিহার করেন।

শ্রুতিভূষণ, মন্ত্রী আপনাকে কী ব'ল্‌চেন?

উনি ব'ল্‌চেন লক্ষ্মীর স্বভাব সম্বন্ধে মহারাজকে কিছু উপদেশ দিতে।

আপনার উপদেশ কী?

বৈরাগ্যবারিধিতে একটি চৌপদী আছে—

যে পদ্মে লক্ষ্মীর বাস, দিন অবসানে
সেই পদ্ম মুদে আসে সকলেই জানে।

গৃহ যাব ফুটে আর মুদে পুনঃপুনঃ

সে লক্ষ্মীরে ত্যাগ কর, শুন মূঢ় শুন !

অহো, আপনার উপদেশের এক ফুৎকারেই আশাপ্রদীপের জ্বলন্ত শিখা নির্ব্বাপিত হ'য়ে যায়। আমাদের আচার্য্য বলেচেন না—

দন্তং গলিতং পলিতং মুণ্ডং

তদপি ন মুঞ্চতি আশাভাণ্ডং !

মহারাজ, আশার কথা যদি তুল্লেন তবে বারিধি থেকে আর একটি চৌপদী শোনাই—

শৃঙ্খল বাঁধিয়া রাখে এই জানি সবে,

আশার শৃঙ্খল কিন্তু অদ্ভুত এ ভবে।

সে যাহারে বাঁধে সেই ঘুরে মরে পাকে,

সে-বন্ধন ছাড়ে যারে স্থির হ'য়ে থাকে।

হায় হায় অমূল্য আপনার বাণী ! শ্রুতিভূষণকে এক সহস্র স্বর্ণমুদ্রা এখনি—ও কি মন্ত্রী, আবার কা'রা গোল ক'র্‌চে ?

সেই দুর্ভিক্ষগ্রস্ত প্রজারা।

ওদের এখনি শান্ত হ'তে বলো।

তাহ'লে, মহারাজ, শ্রুতিভূষণকে ওদের কাছে পাঠিয়ে দিন না—আমরা ততক্ষণ যুদ্ধের পরামর্শটা—

না, না, যুদ্ধ পরে হবে, শ্রুতিভূষণকে ছাড়্‌তে পার্‌চিনে।

মহারাজ, স্বর্ণমুদ্রা দেবার কথা ব'ল্‌ছিলেন কিন্তু সে দান যে ক্ষয় হ'য়ে যাবে। বৈরাগ্যবারিধি লিখ্‌চেন—

স্বর্ণদান করে যেই করে দুঃখ দান,

যত স্বর্ণ ক্ষয় হয় ব্যথা পায় প্রাণ।

শত দাও, লক্ষ দাও, হ'য়ে যায় শেষ,

শূন্য ভাণ্ড ভরি শুধু' থাকে মনঃক্লেশ।

আহা শরীর রোমাঞ্চিত হ'লো। প্রভু কি তাহ'লে—

না আমি সহস্রমুদ্রা চাইনে!

দিন্ দিন্ একটু পদধূলি দিন্! সহস্র মুদ্রা চান্ না। এত বড়ো কথা!

মহারাজ, এই সহস্র মুদ্রা অক্ষয় হ'য়ে যাতে মহারাজের পুণ্যফলকে অসীম করে, আমি এমন কিছু চাই! গোধনসমেত আপনার ঐ কাঞ্চনপুর-জনপদটি যদি ব্রহ্মত্রদান করেন কেবলমাত্র ঐটুকুতেই আমি সন্তুষ্ট থাক্‌বো; কারণ বৈরাগ্যবারিধি ব'ল্‌চেন—

বুঝেছি শ্রুতিভূষণ, এর জন্যে আর বৈরাগ্যবারিধির প্রমাণ দরকার নেই। মন্ত্রী, কাঞ্চনপুর-জনপদটি যাতে শ্রুতিভূষণের বংশে চিরন্তন—আবার কি, বারবার কেন চীৎকার ক'র্‌চে?

চীৎকারটা বারবার ক'র্‌চে বটে কিন্তু কারণটা একই র'য়ে গেছে! ওরা সেই মহারাজের দুর্ভিক্ষ-কাতর প্রজা।

মহারাজ, ব্রাহ্মণী মহারাজকে ব'ল্‌তে ব'লেচেন তিনি তাঁর সর্ব্বাঙ্গে মহারাজের যশোঝঙ্কার ধ্বনিত ক'র্‌তে চান, কিন্তু আভরণের অভাববশতঃ শব্দ বড়োই ক্ষীণ হ'য়ে বাজ্‌চে।

মন্ত্রী!

মহারাজ!

ব্রাহ্মণীর আভরণের অভাবমোচন ক'র্‌তে যেন বিলম্ব না হয়।

আর মন্ত্রীমশায়কে ব'লে দিন, আমরা সর্ব্বদাই পরমার্থচিন্তায় রত, বৎসরে বৎসরে গৃহসংস্কারের চিন্তায় মন দিতে হ'লে চিত্তবিক্ষেপ হয়; অতএব রাজ-শিল্পী যদি আমার গৃহটি সুদৃঢ় ক'রে নির্ম্মাণ ক'রে দেয় তাহ'লে তা'র তলদেশে শান্তমনে বৈরাগ্য-সাধন ক'র্‌তে পারি।

মন্ত্রী, রাজশিল্পীকে যথাবিধি আদেশ ক'রে দাও।

মহারাজ, এবৎসর রাজকোষে ধনাভাব।

সে তো প্রতিবৎসরেই শুনে আস্‌চি। মন্ত্রী, তোমাদের উপর ভার, ধন বৃদ্ধি ক'র্‌বার; আর আমার উপর ভার, অভাব বৃদ্ধি ক'র্‌বার। এই দুইয়ের মিলে সন্ধি ক'রে হয় ধনাভাব।

মহারাজ, মন্ত্রীকে দোষ দিতে পারিনে। উনি দেখ্‌চেন আপনার অর্থ, আর আমরা দেখ্‌চি আপনার পরমার্থ; সুতরাং উনি যেখানে দেখ্‌তে পাচ্ছেন অভাব, আমরা সেইখানে দেখ্‌তে পাচ্চি ধন। বৈরাগ্যবারিধিতে লিখ্‌চেন—

রাজকোষ পূর্ণ হ'য়ে তবু শূন্যমাত্র,
যোগ্য হাতে যাহা পড়ে লভে সৎপাত্র।
পাত্র নাই ধন আছে, থেকেও না থাকা,
পাত্র হাতে ধন, সেই রাজকোষ পাকা।

আহা হা! আপনাদের সঙ্গ অমূল্য।

কিন্তু মহারাজের সঙ্গ কত মূল্যবান, শ্রুতিভূষণমশায় তা বেশ জানেন। তাহ'লে আসুন শ্রুতিভূষণ, বৈরাগ্যসাধনের ফর্দ্দ যা দিলেন, সেটা সংগ্রহ করা যাক্‌!

চলুন তবে চলুন, বিলম্বে কাজ নেই। মন্ত্রী এই সামান্য বিষয় নিয়ে যখন এত অধীর হ'য়েছেন তখন ওঁকে শান্ত ক'রে এখনি আবার ফিরে আস্‌চি।

আমার সর্ব্বদা ভয়, পাছে আপনি রাজাশ্রয় ছেড়ে অরণ্যে চ'লে যান!

মহারাজ, মনটা মুক্ত থাক্‌লে কিছুই ত্যাগ ক'র্‌তে হয় না—এই রাজগৃহে যতক্ষণ আমার সন্তোষ আছে ততক্ষণ এই আমার অরণ্য। এক্ষণে তবে আসি। মন্ত্রী, চলো—চলো।

ঐ যে কবিশেখর আস্‌ছে—আমার তপস্যা ভাঙ্‌লে বুঝি! ওকে ভয় করি! ওরে পাকাচুল, কান ঢেকে থাক্‌রে, কবির বাণী যেন প্রবেশপথ না পায়!

(উভয়ের প্রস্থান)

মহারাজ, আপনার এই কবিকে নাকি বিদায় ক'রতে চান?

কবিত্ব যে বিদায়-সংবাদ পাঠালে এখন কবিকে রেখে হবে কী!

সংবাদটা কোথায় পৌঁছলো?

ঠিক আমার কানের উপর! চেয়ে দেখো!

পাকাচুল? ওটাকে আপনি ভাব্‌চেন কী?

যৌবনের শ্যামকে মুছে ফেলে শাদা করার চেষ্টা।

কারিকরের মতলব বোঝেন নি। ঐ শাদা ভূমিকার উপরে আবার নূতন রং লাগ্‌বে।

কই রঙের আভাস তো দেখিনে।

সেটা গোপনে আছে। শাদার প্রাণের মধ্যে সব রঙেরই বাসা।

চুপ, চুপ, চুপ করো, কবি, চুপ করো!

মহারাজ, এ যৌবন ম্লান যদি হ'লো তো হোক্ না! আরেক যৌবনলক্ষ্মী আস্‌চেন, মহারাজের কেশে তিনি তাঁর শুভ্র মল্লিকার মালা পাঠিয়ে দিয়েচেন—নেপথ্যে সেই মিলনের আয়োজন চ'ল্‌চে।

আরে, আরে, তুমি দেখ্‌চি বিপদ বাধাবে, কবি! যাও যাও, তুমি যাও—ওরে শ্রুতিভূষণকে দৌড়ে ডেকে নিয়ে আয়।

তাঁকে কেন, মহারাজ?

বৈরাগ্য-সাধন ক'র্‌বো।

সেই খবর শুনেই তো ছুটে এসেছি, এ সাধনায় আমিই তো আপনার সহচর।

তুমি?

হাঁ মহারাজ, আমরাই তো পৃথিবীতে আছি মানুষের আসক্তি মোচন ক'র্‌বার জন্য।

বুঝতে পার্‌লুম না।

এতদিন কাব্য শুনিয়ে এলুম তবু বুঝ্‌তে পার্‌লেন না? আমাদের কথার মধ্যে বৈরাগ্য, সুরের মধ্যে বৈরাগ্য, ছন্দের মধ্যে বৈরাগ্য।

সেইজন্যেই তো লক্ষ্মী আমাদের ছাড়েন, আমরাও লক্ষ্মীকে ছাড়্‌বার জন্যে যৌবনের কানে মন্ত্র দিয়ে বেড়াই !

তোমাদের মন্ত্রটা কী ?

আমাদের মন্ত্র এই যে, ওরে ভাই, ঘরের কোণে তোদের থলি থালি আঁকড়ে বসে' থাকিস্‌নে—বেরিয়ে পড়্‌ প্রাণের সদর রাস্তায়, ওরে যৌবনের বৈরাগীর দল !

সংসারের পথটাই বুঝি তোমার বৈরাগ্যের পথ হ'লো ?

তা নয় তো কী মহারাজ ? সংসারে যে কেবলি সরা, কেবলি চলা ; তা'রই সঙ্গে সঙ্গে যে-লোক একতারা বাজিয়ে নৃত্য ক'র্‌তে ক'র্‌তে কেবলি সরে, কেবলি চলে, সেই তো বৈরাগী, সেই তো পথিক, সেই তো কবিবাউলের চেলা ।

তাহ'লে শান্তি পাবো কী ক'রে ?

শান্তির উপরে তো আমাদের একটুও আসক্তি নেই, আমরা যে বৈরাগী ।

কিন্তু ধ্রুব সম্পদটি তো পাওয়া চাই ।

ধ্রুব সম্পদে আমাদের একটুও লোভ নেই, আমরা যে বৈরাগী ।

সে কি কথা ?—বিপদ বাধাবে দেখ্‌চি ! ওরে শ্রুতিভূষণকে ডাক্‌ ।

আমরা অধ্রুব মন্ত্রের বৈরাগী । আমরা কেবলি ছাড়্‌তে ছাড়্‌তে পাই, তাই ধ্রুবটাকে মানিনে ।

এ তোমার কী রকম কথা ?

পাহাড়ের গুহা ছেড়ে যে নদী বেরিয়ে পড়েচে তা'র বৈরাগ্য কি দেখেন নি মহারাজ ? সে অনায়াসে আপনাকে ঢেলে দিতে-দিতেই আপনাকে পায় । নদীর পক্ষে ধ্রুব হচ্চে বালির মরুভূমি—তা'র মধ্যে সেঁধ্‌লেই বেচারা গেলো । তা'র দেওয়া যেম্‌নি ঘোচে অম্‌নি তা'র পাওয়াও ঘোচে ।

ঐ শোনো কবিশেখর, কান্না শোনো । ঐ তো তোমার সংসার !

ওরা মহারাজের দুর্ভিক্ষকাতর প্রজা।

আমার প্রজা? বল কী কবি? সংসারের প্রজা ওরা। এ দুঃখ কি আমি সৃষ্টি ক'রেচি? তোমার কবিত্বমন্ত্রের বৈরাগীরা এ দুঃখের কী প্রতিকার ক'র্‌তে পারে বলো তো!

মহারাজ, এ দুঃখকে তো আমরাই বহন ক'র্‌তে পারি! আমরা যে নিজেকে ঢেলে দিয়ে ব'য়ে চলেচি। নদী কেমন করে' ভার বহন করে দেখেচেন তো? মাটির পাকা রাস্তাই হ'লো যাকে বলেন ধ্রুব, তাই তো ভারকে কেবলি সে ভারী করে' তোলে; বোঝা তা'র উপর দিয়ে আর্ত্তনাদ ক'র্‌তে ক'র্‌তে চলে, আর তা'রও বুক ক্ষত বিক্ষত হ'য়ে যায়। নদী আনন্দে ব'য়ে চলে, তাই তো সে আপনার ভার লাঘব ক'রেচে বলেই বিশ্বের ভার লাঘব করে। আমরা ডাক দিয়েচি সকলের সব সুখ-দুঃখকে চলার লীলায় ব'য়ে নিয়ে যাবার জন্যে। আমাদের বৈরাগীর ডাক। আমাদের বৈরাগীর সর্দ্দার যিনি, তিনি এই সংসারের পথ দিয়ে নেচে চলেচেন—তাই তো বসে' থাক্‌তে পারিনে,—

পথ দিয়ে কে যায় গো চলে'
ডাক দিয়ে সে যায়।
আমার ঘরে থাকাই দায়।

যাক্‌গে শ্রুতিভূষণ! ওহে কবিশেখর, আমার কী মুস্কিল হ'য়েচে জানো? তোমার কথা আমি এক বিন্দুবিসর্গও বুঝ্‌তে পারিনে অথচ তোমার সুরটা আমার বুকে গিয়ে বাজে। আর শ্রুতিভূষণের ঠিক তার উল্টো; তা'র কথাগুলো খুবই স্পষ্ট বোঝা যায় হে,—ব্যাকরণের সঙ্গেও মেলে—কিন্তু সুরটা—সে কী আর বল্‌বো!

মহারাজ, আমাদের কথা তো বোঝ্‌বার জন্যে হয় নি, বাজ্‌বার জন্যে হ'য়েচে!

এখন তোমার কাজটা কী বলো তো কবি ?

মহারাজ, ঐ যে তোমার দরজার বাইরে কান্না উঠেচে ঐ কান্নার মাঝখান দিয়ে এখন ছুট্‌তে হবে।

ওহে কবি, বলো কী তুমি! এ সমস্ত কেজো লোকের কাজ, দুর্ভিক্ষের মধ্যে তোমরা কী ক'র্‌বে ?

কেজো লোকেরা কাজ বেসুরো ক'রে ফেলে, তাই সুর বাঁধ্‌বার জন্যে আমাদের ছুটে আস্‌তে হয়!

ওহে কবি, আর একটু স্পষ্ট ভাষায় কথা কও!

মহারাজ, ওরা কর্ত্তব্যকে ভালবাসে ব'লে কাজ করে,—এইজন্যে ওরা আমাদের গাল দেয়,—বলে নিষ্কর্ম্মা, আমরা ওদের গাল দিই,—বলি নির্জ্জীব!

কিন্তু জিৎটা হ'লো কা'র ?

আমাদের, মহারাজ, আমাদের!

তা'র প্রমাণ ?

পৃথিবীতে যা কিছু সকলের বড়ো, তা'র প্রমাণ নেই। পৃথিবীতে যত কবি, যত কবিত্ব—সমস্ত যদি ধুয়ে মুছে ফেল্‌তে পারো তাহ'লেই প্রমাণ হবে, এতদিন কেজো লোকেরা তাদের কাজের জোরটা কোথা থেকে পাচ্ছিলো, তাদের ফসলক্ষেতের মূলের রস জুগিয়ে এসেচে কা'রা! মহারাজ, আপনার দরজার বাইরে ঐ যে কান্না উঠেচে সে কান্না থামায় কা'রা ? যারা বৈরাগ্যবারিধির তলায় ডুব মেরেচে তা'রা নয়, যারা বিষয়কে আঁকড়ে ধ'রে র'য়েচে তা'রা নয়, যারা কাজের কৌশলে হাড় পাকিয়েছে তা'রাও নয়, যারা কর্ত্তব্যের শুষ্ক রুদ্রাক্ষের মালা জ'প্‌চে তা'রাও নয়, অপর্য্যাপ্ত প্রাণকে বুকের মধ্যে পেয়েচে বলেই জগতের কিছুতে যাদের উপেক্ষা নেই, জয় করে তা'রা;—ত্যাগ করেও তা'রাই, বাঁচ্‌তে জানে তা'রা, ম'র্‌তেও জানে

তা'রা, তা'রা জোরের সঙ্গে দুঃখ দূর করে,—সৃষ্টি করে তা'রাই, কেন না তাদের মন্ত্র আনন্দের মন্ত্র, সব চেয়ে বড়ো বৈরাগ্যের মন্ত্র।

ওহে কবি, তা'হলে তুমি আমাকে কী ক'র্‌তে বলো ?

উঠ্‌তে বলি, মহারাজ, চ'ল্‌তে বলি। ঐ যে কান্না, ওযে প্রাণের কাছে প্রাণের আহ্বান! কিছু ক'র্‌তে পার্‌বো কি না সে পরের কথা—কিন্তু ডাক শুনে যদি ভিতরে সাড়া না দেয়, প্রাণ যদি না ..লে ওঠে তবে অকর্ত্তব্য হ'লো ব'লে ভাবনা নয়, তবে ভাবনা ম'রেচি ব'লে।

কিন্তু ম'র্‌বোই যে, কবিশেখর, আজ হোক্ আর কাল হোক্।

কে বল্লে মহারাজ, মিথ্যা কথা! যখন দেখ্‌চি বেঁচে আছি, তখন জান্‌চি যে বাঁচ্‌বোই;—যে আপনার সেই বাঁচাটাকে সব দিক থেকে যাচাই ক'রে দেখ্‌লে না সেই বলে "নলিনীদলগতজলমতিতরলং তদ্বৎজীবনমতিশয়চপলং।"

কী বলো হে, কবি, জীবন চপল নয় ?

চপল বই কি, কিন্তু অনিত্য নয়। চপল জীবনটা চিরদিন চপলতা ক'র্‌তে-কর্‌তেই চ'ল্‌বে। মহারাজ, আজ তুমি তা'র চপলতা বন্ধ করে' ম'র্‌বার পালা অভিনয় আরম্ভ ক'র্‌তে বসেছ ?

ঠিক ব'ল্‌চো কবি ? আমরা বাঁচ্‌বোই ?

বাঁচ্‌বোই!

যদি বাঁচ্‌বোই তবে বাঁচার মতো করেই বাঁচ্‌তে হবে—কী বলো!

হাঁ মহারাজ!

প্রতিহারী!

কী মহারাজ!

ডাকো, ডাকো, মন্ত্রীকে এখনি ডাকো।

কী মহারাজ।

মন্ত্রী, আমাকে এতক্ষণ বসিয়ে রেখেচো কেন ?

ব্যস্ত ছিলুম।

কিসে?

বিজয়বর্ম্মাকে বিদায় ক'রে দিতে।

কী মুস্কিল! বিদায় ক'র্‌বে কেন? যুদ্ধের পরামর্শ আছে যে!

চীনের সম্রাটের দূতের জন্যে বাহনের ব্যবস্থা—

কেন, বাহন কিসের?

মহারাজের তো দর্শন হবে না তাই তাঁকে ফিরিয়ে দেবার—

মন্ত্রী, আশ্চর্য্য ক'র্‌লে দেখ্‌চি—রাজকার্য্য কি এমনি করেই চ'ল্‌বে? হঠাৎ তোমার হ'লো কি?

তা'র পরে আমাদের কবিশেখরের বাসা ভাঙ্‌বার জন্যে লোকের সন্ধান ক'র্‌ছিলুম—আর তো কেউ রাজী হয় না. কেবল দিঙ্‌নাগের বংশে যাঁরা অলঙ্কারের আর ব্যাকরণ শাস্ত্রের টোল খুলেচেন তাঁরা দলে-দলে সাবল হাতে ছুটে আস্‌চেন।

সর্ব্বনাশ! মন্ত্রী, পাগল হ'লে না কি? কবিশেখরের বাসা ভেঙে দেবো?

ভয় নেই মহারাজ, বাসাটা একেবারে ভাঙ্‌তে হবে না। শ্রুতিভূষণ খবর পেয়েই স্থির ক'রেচেন কবিশেখরের ঐ বাসাটা আজ থেকে তিনিই দখল ক'র্‌বেন!

কী বিপদ! সরস্বতী যে তা হ'লে তাঁর বীণাখানা আমার মাথার উপর আছ্‌ড়ে ভেঙে ফেল্‌বেন! না, না, সে হবে না!

আর একটা কাজ ছিলো—শ্রুতিভূষণকে কাঞ্চনপুরের সেই বৃহৎ জনপদটা—

ও হো, সেই জনপদটার দানপত্র তৈরি হ'য়েছে বুঝি? সেটা কিন্তু আমাদের এই কবিশেখরকে—

সে কি কথা মহারাজ! আমার পুরস্কার তো জনপদ নয়—আমরা জন-পদের সেবা তো কখনো করিনি—তাই ঐ পদপ্রাপ্তিটা আশাও করিনে।

আচ্ছা, তবে ওটা শ্রুতিভূষণের জন্যেই থাক্!

আর, মহারাজ, দুর্ভিক্ষপীড়িত প্রজাদের বিদায় ক'র্‌বার জন্যে সৈন্যদলকে আহ্বান ক'রেচি।

মন্ত্রী, আজ দেখ্‌চি পদে পদে তোমার বুদ্ধির বিভ্রাট ঘ'ট্‌চে। দুর্ভিক্ষ-কাতর প্রজাদের বিদায় ক'র্‌বার ভালো উপায় অন্ন দিয়ে, সৈন্য দিয়ে নয়।

মহারাজ!

কী প্রতিহারী!

বৈরাগ্যবারিধি নিয়ে শ্রুতিভূষণ এসেচেন!

সর্ব্বনাশ ক'র্‌লে! ফেরাও তা'কে ফেরাও! মন্ত্রী, দেখো হঠাৎ যেন শ্রুতিভূষণ না এসে পড়ে! আমার দুর্ব্বল মন, হয়তো সামলাতে পার্‌বো না, হয়তো অন্যমনস্ক হ'য়ে বৈরাগ্যবারিধির ডুব-জলে গিয়ে প'ড়্‌বো। ওহে কবিশেখর, আমাকে কিছুমাত্র সময় দিয়ো না—প্রাণটাকে জাগিয়ে রাখো—একটা যা-হয়-কিছু ক'রো—যেমন এই ফাল্গুনের হাওয়াটা যা-খুসি-তাই ক'র্‌চে তেমনিতর! হাতে কিছু তৈরি আছে হে? একটা নাটক, কিম্বা প্রকরণ, কিম্বা রূপক, কিম্বা ভাণ, কিম্বা—

তৈরি আছে—কিন্তু সেটা নাটক, কি প্রকরণ, কি রূপক, কি ভাণ তা ঠিক্ বল্‌তে পার্‌বো না!

যা রচনা ক'রেচ তা'র অর্থ কি কিছু গ্রহণ ক'র্‌তে পার্‌বো?

না মহারাজ! রচনা তো অর্থ গ্রহণ ক'র্‌বার জন্যে নয়।

তবে?

সেই রচনাকেই গ্রহণ ক'র্‌বার জন্যে। আমি তো বলেচি আমার এ সব জিনিস বাঁশির মতো, বোঝ্‌বার জন্যে নয়, বাজ্‌বার জন্যে।

বলো কি হে কবি, এর মধ্যে তত্ত্বকথা কিছুই নেই?

কিচ্ছু না।

তবে তোমার ও রচনাটা ব'ল্‌চে কী ?

ও ব'ল্‌চে, আমি আছি ! শিশু জন্মাবামাত্র চেঁচিয়ে ওঠে, সেই কান্নার মানে জানেন মহারাজ ? শিশু হঠাৎ শুন্‌তে পায় জল-স্থল-আকাশ তা'কে চারদিক থেকে বলে' উঠেচে—"আমি আছি !"—তা'রই উত্তরে ঐ প্রাণটুকু সাড়া পেয়ে বলে' ওঠে—"আমি আছি !" আমার রচনা সেই সদ্যোজাত শিশুর কান্না, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ডাকের উত্তরে প্রাণের সাড়া।

তা'র বেশি আর কিচ্ছু না ?

কিচ্ছু না ! আমার রচনার মধ্যে প্রাণ ব'লে উঠেচে,—সুখে দুঃখে, কাজে বিশ্রামে, জন্মে মৃত্যুতে, জয়ে-পরাজয়ে, লোক লোকান্তরে—"জয়, এই 'আমি-আছি'র জয়, জয়, এই আনন্দময় 'আমি-আছি'র জয় !"

ওহে কবি, তত্ত্ব না থাক্‌লে আজকের দিনে তোমার এ জিনিস চ'ল্‌বে না।

সে কথা সত্য মহারাজ ! আজকের দিনে আধুনিকেরা উপার্জ্জন ক'র্‌তে চায় উপলব্ধি ক'র্‌তে চায় না ! ওরা বুদ্ধিমান !

তা হ'লে শ্রোতা কাদের ডাকা যায় ? আমার রাজবিদ্যালয়ের নবীন ছাত্রদের ডাক্‌বো কি ?

না মহারাজ, তা'রা কাব্য শুনেও তর্ক করে ! নতুন শিং ওঠা হরিণ-শিশুর মতো ফুলের গাছকেও গুঁতো মেরে মেরে বেড়ায় !

তবে ?

ডাক দেবেন যাদের চুলে পাক ধ'রেচে।

সে কি কথা কবি ?

হাঁ মহারাজ, সেই প্রৌঢ়দেরই যৌবনটি নিরাসক্ত যৌবন। তা'রা ভোগবতী পার হ'য়ে আনন্দলোকের ডাঙা দেখ্‌তে পেয়েচে। তা'রা আর ফল চায় না, ফ'ল্‌তে চায়।

ওহে কবি, তবে তো এতদিন পরে ঠিক আমার কাব্য শোন্‌বার বয়েস হয়েচে। বিজয়বর্ম্মাকেও ডাকা যাক্‌!

ডাকুন্‌।

চীন-সম্রাটের দূতকে?

ডাকুন!

আমার শ্বশুর এসেছেন শুন্‌চি—

তাঁকে ডাক্‌তে পারেন—কিন্তু শ্বশুরের ছেলেগুলির সম্বন্ধে সন্দেহ আছে।

তাই বলে' শ্বশুরের মেয়ের কথাটা ভুলো না কবি।

আমি ভুল্‌লেও তাঁর সম্বন্ধে ভুল হবার আশঙ্কা নেই।

আর শ্রুতিভূষণকে?

না মহারাজ, তাঁর প্রতি তো আমার কিছুমাত্র বিদ্বেষ নেই, তাঁকে কেন দুঃখ দিতে যাবো?

কবি তাহ'লে প্রস্তুত হওগে!

না মহারাজ, আমি অপ্রস্তুত হ'য়েই কাজ ক'র্‌তে চাই। বেশি বানাতে গেলেই সত্য ছাই-চাপা পড়ে।

চিত্রপট—

চিত্রপটে প্রয়োজন নেই—আমাদের দরকার চিত্তপট—সেইখানে শুধু সুরের তুলি বুলিয়ে ছবি জাগাবো।

এ নাটকে গান আছে না কি?

হাঁ মহারাজ, গানের চাবি দিয়েই এর এক-একটি অঙ্কের দরজা খোলা হবে।

গানের বিষয়টা কি?

শীতের বস্ত্রহরণ।

এ তো কোনো পুরাণে পড়া যায় নি।

বিশ্বপুরাণে এই গীতের পালা আছে! ঋতুর নাট্যে বৎসরে বৎসরে শীত-বুড়োটার ছদ্মবেশ খসিয়ে তা'র বসন্ত-রূপ প্রকাশ করা হয়, দেখি পুরাতনটাই নূতন।

এ তো গেলো গানের কথা, বাকিটা ?

বাকিটা প্রাণের কথা।

সে কি-রকম ?

যৌবনের দল একটা বুড়োর পিছনে ছুটে চলেছে। তা'কে ধ'র্‌বে বলে' পণ। গুহার মধ্যে ঢুকে যখন ধ'র্‌লে তখন—

তখন কী দেখ্‌লে ?

কী দেখ্‌লে সেটা যথাসময়ে প্রকাশ হবে।

কিন্তু একটা কথা বুঝ্‌তে পার্‌লুম না। তোমার গানের বিষয় আর তোমার নাট্যের বিষয়টা আলাদা না কি ?

না মহারাজ—বিশ্বের মধ্যে বসন্তের যে লীলা চল্‌চে, আমাদের প্রাণের মধ্যে যৌবনের সেই একই লীলা। বিশ্বকবির সেই গীতিকাব্য থেকেই তো ভাব চুরি ক'রেচি।

তোমার নাটকের প্রধান পাত্র কে কে ?

এক হচ্চে সর্দ্দার।

সে কে ?

যে আমাদের কেবলই চালিয়ে দিয়ে যাচ্চে। আর একজন হচ্চে চন্দ্রহাস।

সে কে ?

যাকে আমরা ভালোবাসি—আমাদের প্রাণকে সেই প্রিয় ক'র্‌চে।

আর কে আছে ?

দাদা—প্রাণের আনন্দটাকে যে অনাবশ্যক বোধ করে', কাজটাকেই যে সার মনে ক'রেচে।

আমার মনের রাগরাগিণী
রাঙা হ'লো রঙীন তানে।
দখিন হাওয়ায় কুসুমবনের
বুকের কাঁপন থামে না যে।
নীল আকাশে সোনার আলোয়
কচি পাতার নূপুর বাজে।
ওরে শিরীষ, ওরে শিরীষ,
মৃদু হাসির অন্তরালে
গন্ধজালে শূন্য ঘিরিস্!
তোমার গন্ধ আমার কণ্ঠে
আমার হৃদয় টেনে আনে।

৩

ফুলন্ত গাছের গান

ওগো নদী, আপন বেগে
পাগল-পারা,
আমি স্তব্ধ চাঁপার তরু
গন্ধভরে তন্দ্রাহারা।
আমি সদা অচল থাকি,
গভীর চলা গোপন রাখি,
আমার চলা নবীন পাতায়,
আমার চলা ফুলের ধারা।

ওগো নদী, চলার বেগে
পাগল-পারা,
পথে পথে বাহির হ'য়ে
আপন-হারা।
আমার চলা যায় না বলা,
আলোর পানে প্রাণের চলা,
আকাশ বোঝে আনন্দ তা'র,
বোঝে নিশার নীরব তারা।

———

প্রথম দৃশ্য

পথ

সূত্রপাত

যুবকদলের প্রবেশ

গান

ওরে ভাই, ফাগুন লেগেছে বনে বনে,—
ডালে ডালে ফুলে ফলে পাতায় পাতায় রে,
আড়ালে আড়ালে কোণে কোণে।
রঙে রঙে রঙিল আকাশ,
গানে গানে নিখিল উদাস,
যেন চল-চঞ্চল নব পল্লবদল
মর্ম্মরে মোর মনে মনে।
ফাগুন লেগেছে বনে বনে।

হের হের অবনীর রঙ্গ,
গগনের করে তপোভঙ্গ।
হাসির আঘাতে তা'র মৌন রহে না আর
কেঁপে কেঁপে ওঠে ক্ষণে ক্ষণে।
বাতাস ছুটিছে বনময় রে,
ফুলের না জানে পরিচয় রে।
তাই বুঝি বারে বারে কুঞ্জের দ্বারে দ্বারে
শুধায়ে ফিরিছে জনে জনে।
ফাগুন লেগেছে বনে বনে॥

ফাগুনের গুণ আছেরে, ভাই, গুণ আছে!

বুঝ্‌লি কি করে'?

নইলে আমাদের এই দাদাকে বাইরে টেনে আনে কিসের জোরে?

তাই তো—দাদা আমাদের চৌপদীছন্দের বোঝাই নৌকো—ফাগুনের গুণে বাঁধা পড়ে' কাগজ কলমের উল্টো মুখে উজিয়ে চ'লেছে।

চন্দ্রহাস। ওরে ফাগুনের গুণ নয়রে! আমি চন্দ্রহাস, দাদার তুলট কাগজের হল্‌দে পাতাগুলো পিয়াল-বনের সবুজ পাতার মধ্যে লুকিয়ে রেখেছি; দাদা খুঁজ্‌তে বের হ'য়েছে।

তুলট কাগজগুলো গেছে আপদ গেছে, কিন্তু দাদার শাদা চাদরটা তো কেড়ে নিতে হচ্চে।

চন্দ্রহাস। তাই তো, আজ পৃথিবীর ধূলোমাটি পর্য্যন্ত শিউরে উঠেছে, আর এ পর্য্যন্ত দাদার গায়ে বসন্তর আমেজ লাগ্‌লো না!

দাদা। আহা কী মুস্কিল! বয়েস হয়েছে যে!

পৃথিবীর বয়েস অন্তত তোমার চেয়ে কম নয়, কিন্তু নবীন হ'তে ওর লজ্জা নেই।

চন্দ্রহাস। দাদা, তুমি ব'সে' ব'সে' চৌপদী লিখ্‌চো, আর এই চেয়ে দেখ সমস্ত জলস্থল কেবল নবীন হবার তপস্যা ক'র্‌চে।

দাদা, তুমি কোটরে ব'সে' কবিতা লেখ কি ক'রে' ?

দাদা। আমার কবিতা তো তোদের কবিশেখরের কল্পমঞ্জরীর মতো সৌখীন কাব্যের ফুলের চাষ নয় যে, কেবল বাইরের হাওয়ায় দোল খাবে। এতে সার আছেরে, ভার আছে।

যেমন কচু। মাটির দখল ছাড়ে না।

দাদা। শোন্ তবে বলি,—

ঐরে দাদা এবার চৌপদী বের ক'র্‌বে!

এলোরে এলো চৌপদী এলো! আর ঠেকানো গেলো না।

ভো ভো পথিকবৃন্দ, সাবধান দাদার মত্ত চৌপদী চঞ্চল হ'য়ে উঠেছে।

চন্দ্রহাস। না দাদা, তুমি ওদের কথায় কান দিয়ো না। শোনাও তোমার চৌপদী! কেউ না টিঁক্‌তে পারে আমি শেষ পর্য্যন্ত টিঁকে থাক্‌বো। আমি ওদের মতো কাপুরুষ নই।

আচ্ছা বেশ, আমরাও।

যেমন করে' পারি শুন্‌বোই।

খাড়া দাঁড়িয়ে শুন্‌বো। পালাবো না।

চৌপদীর চোট যদি লাগে তো বুকে লাগ্‌বে, পিঠে লাগ্‌বে না।

কিন্তু দোহাই দাদা, একটা! তা'র বেশি নয়।

দাদা। আচ্ছা, তবে তোরা শোন্!

বংশে শুধু বংশী যদি বাজে
বংশ তবে ধ্বংস হবে লাজে!
বংশ নিঃস্ব নহে বিশ্বমাঝে
যে হেতু সে লাগে বিশ্বকাজে।

আর একটু ধৈর্য্য ধরো ভাই, এর মানেটা—

আবার মানে!

একে চৌপদী—তা'র উপর আবার মানে!

দাদা। একটু বুঝিয়ে দিই—অর্থাৎ বাঁশে যদি কেবলমাত্র বাঁশিই বাজ্‌তো তাহ'লে—

না আমরা বুঝ্‌বো না!

কোনোমতেই বুঝ্‌বো না!

কা'র সাধ্য আমাদের বোঝায়!

আমরা কিচ্ছু বুঝ্‌বো না বলেই আজ বেরিয়ে প'ড়েছি।

আজ কেউ যদি আমাদের জোর ক'রে' বোঝাতে চায়, তাহ'লে আমরা জোর ক'রে' ভুল বুঝ্‌বো।

দাদা। ও শ্লোকটার অর্থ হচ্চে এই যে, বিশ্বের হিত যদি না করি তবে—

তবে? বিশ্ব হাঁফ ছেড়ে বাঁচে!

দাদা। ঐ কথাটাকেই আর একটু স্পষ্ট ক'রে' ব'লেছি—

অসংখ্য নক্ষত্র জ্বলে সশঙ্ক-নিশীথে।
অম্বরে লম্বিত তারা লাগে কা'র হিতে?
শূন্যে কোন পুণ্য আছে আলোক বাঁটিতে?
মর্ত্ত্যে এলে কর্ম্মে লাগে মাটিতে হাঁটিতে।

ও, তবে আমাদের কথাটাকেও আর একটু স্পষ্ট করে' ব'ল্‌তে হ'লো দেখ্‌চি! ধর দাদাকে ধর—ওকে আড়কোলা করে' নিয়ে চলো ওর কোটরে!

দাদা। তোরা অত ব্যস্ত হচ্চিস্ কেন বল্‌তো? বিশেষ কাজ আছে?

বিশেষ কাজ।

অত্যন্ত জরুরি।

দাদা। কাজটাকী শুনি?

বসন্তের ছুটিতে আমাদের খেলাটা কী হবে তাই খুঁজে বের ক'র্‌তে বেরিয়েছি।

দাদা। খেলা? দিন রাতই খেলা?

সকলের গান

মোদের যেমন খেলা তেমনি যে কাজ
জানিস্‌নে কি ভাই?
তাই কাজকে কভু আমরা না ডরাই।
খেলা মোদের লড়াই করা,
খেলা মোদের বাঁচা মরা,
খেলা ছাড়া কিছুই কোথাও নাই।

ঐ যে আমাদের সর্দ্দার আস্‌চে ভাই!

আমাদের সর্দ্দার!

সর্দ্দার। কিরে ভারি গোল বাধিয়েছিস্‌ যে!

চন্দ্রহাস। তাই বুঝি থাক্‌তে পার্‌লে না?

সর্দ্দার। বেরিয়ে আস্‌তে হ'লো।

ঐ জন্যেই গোল করি।

সর্দ্দার। ঘরে বুঝি টিঁক্‌তে দিবি নে?

তুমি ঘরে টিঁক্‌লে আমরা বাইরে টিঁকি কি করে'?

চন্দ্রহাস। এত বড়ো বাইরেটা পত্তন ক'র্‌তে তো চন্দ্রসূর্য্যতারা কম খরচ হয় নি, এটাকে আমরা যদি কাজে লাগাই তবে বিধাতার মুখরক্ষা হবে।

সর্দ্দার। তোদের কথাটা কী হচ্চে বল্‌ তো?

কথাটা হচ্চে এই :—

মোদের যেমন খেলা তেমনি যে কাজ
জানিস্‌ নে কি ভাই?

সর্দ্দার

গান

খেল্‌তে খেল্‌তে ফুটেছে ফুল,

খেল্‌তে খেল্‌তে ফল যে ফলে,

খেলারই ঢেউ জলে স্থলে।

ভয়ের ভীষণ রক্তরাগে

খেলার আগুন যখন লাগে

ভাঙাচোরা জ্বলে' যে হয় ছাই।

সকলে

মোদের যেমন খেলা তেমনি যে কাজ

জানিস্‌ নে কি ভাই?

আমাদের এই খেলাটাতেই দাদার আপত্তি।

দাদা। কেন আপত্তি করি ব'ল্‌বো? শুন্‌বি?

ব'ল্‌তে পার দাদা, কিন্তু শুন্‌বো কি না তা ব'ল্‌তে পারিনে।

দাদা।

সময় কাজেরই বিত্ত, খেলা তাহে চুরি।

সিঁধ কেটে দণ্ডপল লহ ভূরি ভূরি।

কিন্তু চোরাধন নিয়ে নাহি হয় কাজ।

তাই তো খেলারে বিজ্ঞ দেয় এত লাজ।

চন্দ্রহাস। বলো কি তুমি দাদা? সময় জিনিসটাই যে খেলা, কেবল চলে' যাওয়াই তা'র লক্ষ্য।

দাদা। তাহ'লে কাজটা?

চন্দ্রহাস। চলার বেগে যে ধূলো ওড়ে কাজটা তাই, ওটা উপলক্ষ্য।

দাদা। আচ্ছা সর্দ্দার, তুমি এর নিষ্পত্তি করে' দাও।

সর্দ্দার। আমি কিছুরই নিষ্পত্তি করিনে। সঙ্কট থেকে সঙ্কটে নিয়ে চলি—
ঐ আমার সর্দ্দারি।

দাদা। সব জিনিসের সীমা আছে কিন্তু তোদের যে কেবলি ছেলেমানুষি!
তা'র কারণ, আমরা যে কেবলি ছেলেমানুষ! সব জিনিসের সীমা
আছে কেবল ছেলেমানুষির সীমা নেই।

(দাদাকে ঘেরিয়া নৃত্য)

দাদা। তোদের কি কোনোকালেই বয়েস হবে না?
না, হবে না বয়েস, হবে না।
বুড়ো হ'য়ে ম'র্‌বো তবু বয়েস হবে না।
বয়েস হ'লেই সেটাকে মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢেলে নদী পার করে' দেবো।
মাথা মুড়োবার খরচ লাগ্‌বে না ভাই—তা'র মাথা ভরা টাক।

গান

আমাদের পাক্‌বে না চুল গো,—মোদের
পাক্‌বে না চুল।
আমাদের ঝ'র্‌বে না ফুল গো,—মোদের
ঝ'র্‌বে না ফুল।
আমরা ঠেক্‌বো না তো কোনো শেষে,
ফুরয় না পথ কোনো দেশে রে!
আমাদের ঘুচ্‌বে না ভুল গো,—মোদের
ঘুচ্‌বে না ভুল।

সর্দ্দার

আমরা নয়ন মুদে ক'র্‌বো না ধ্যান
ক'র্‌বো না ধ্যান।

নিজের মনের কোণে খুঁজ্‌বো না জ্ঞান
খুঁজ্‌বো না জ্ঞান।
আমরা ভেসে চলি স্রোতে স্রোতে
সাগর পানে শিখর হ'তে রে,
আমাদের মিল্‌বে না কূল গো,—মোদের
মিল্‌বে না কূল!

এই উঠ্‌তি বয়সেই দাদার যে রকম মতি গতি, তা'তে কোন্ দিন উনি সেই বুড়োর কাছে মন্তর নিতে যাবেন—আর দেরি নাই!

সর্দ্দার। কোন্ বুড়ো রে?

চন্দ্রহাস। সেই যে মান্ধাতার আমলের বুড়ো। কোন্ গুহার মধ্যে তলিয়ে থাকে, ম'রবার নাম করে না!

সর্দ্দার। তা'র খবর তোরা পেলি কোথা থেকে?

যার সঙ্গে দেখা হয় সবাই তা'র কথা বলে।

পুঁথিতে তা'র কথা লেখা আছে।

সর্দ্দার। তা'র চেহারাটা কি রকম?

কেউ বলে, সে শাদা, মড়ার মাথার খুলির মতো; কেউ বলে, সে কালো, মড়ার চোখের কোটরের মতো।

কেন, তুমি কি তা'র খবর রাখ না সর্দ্দার?

সর্দ্দার। আমি তা'কে বিশ্বাস করিনে।

বাঃ, তুমি উল্টো কথা বল্লে। সেই বুড়োই তো সব চেয়ে বেশি করে' আছে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পাঁজরের ভিতরে তা'র বাসা।

পণ্ডিতজি বলে, বিশ্বাস যদি কাউকে না ক'র্‌তে হয়, সে কেবল আমাদের। আমরা আছি কি নেই তা'র কোনো ঠিকানাই নেই।

চন্দ্রহাস। আমরা যে ভারি কাঁচা, আমরা যে একেবারে নতুন ;—ভবের রাজ্যে আমাদের পাকা দলিল কোথায় ?

সর্দ্দার। সর্ব্বনাশ ক'র্‌লে দেখ্‌চি ? তোরা পণ্ডিতের কাছে আনাগোনা সুরু করেছিস্ নাকি ?

তা'তে ক্ষতি কি সর্দ্দার ?

সর্দ্দার। পুঁথির বুলির দেশে ঢুক্‌লে যে একেবারে ফ্যাকাসে হ'য়ে যাবি। কার্ত্তিকমাসের শাদা কুয়াশার মতো। তোদের মনের মধ্যে একটুও রক্তের রং থাক্‌বে না। আচ্ছা এক কাজ কর্! তোরা খেলার কথা ভাব্‌ছিলি ?

হাঁ সর্দ্দার, ভাবনায় আমাদের চোখে ঘুম ছিলো না।

আমাদের ভাবনার চোটে পাড়ার লোক রাজদরবারে নালিশ ক'র্‌তে ছুটেছিলো।

সর্দ্দার। একটা নতুন খেলা ব'ল্‌তে পারি।

বলো, বলো, বলো!

সর্দ্দার। তোরা সবাই মিলে বুড়োটাকে ধরে' নিয়ে আয়!

নতুন বটে, কিন্তু এটা ঠিক খেলা কি না জানি নে।

সর্দ্দার। আমি ব'ল্‌ছি এ তোরা পার্‌বিনে।

পার্‌বো না ? বলো কি! পার্‌বোই!

সর্দ্দার। কখনো পার্‌বি নে।

আচ্ছা যদি পারি!

সর্দ্দার। তাহ'লে গুরু বলে' আমি তোদের মান্‌বো।

গুরু! সর্ব্বনাশ! আমাদের সুদ্ধ বুড়ো বানিয়ে দেবে ?

সর্দ্দার। তবে কী চাস্ বল ?

তোমার সর্দ্দারি আমরা কেড়ে নেবো।

সর্দ্দার। তাহ'লে তো বাঁচিরে! তোদের সর্দ্দারি কি সোজা কাজ? এমনি অস্থির করে' রেখেছিস্ যে হাড়গুলোসুদ্ধ উল্টোপাল্টা হ'য়ে গেছে।—তাহ'লে রইলো কথা?

চন্দ্রহাস। হাঁ রইলো কথা! দোলপূর্ণিমার দিনে তা'কে ঝোলার উপর দোলাতে দোলাতে তোমার কাছে হাজির করে' দেবো।

সর্দ্দার। বসন্ত উৎসব ক'র্বো।

বলো কি? তাহ'লে যে আমের বোলগুলো ধ'র্তে ধ'র্তেই আঁটি হ'য়ে যাবে!

আর কোকিলগুলো প্যাঁচা হ'য়ে সব লক্ষ্মীর খোঁজে বেরবে।

চন্দ্রহাস। আর ভ্রমরগুলো অনুস্বর বিসর্গের চোটে বাতাসটাকে ঘুলিয়ে দিয়ে মন্তর জপ্‌তে থাকিবে।

সর্দ্দার। আর তোদের খুলিটা সুবুদ্ধিতে এমনি বোঝাই হবে যে এক পা ন'ড়্‌তে পার্বি নে।

সর্ব্বনাশ!

সর্দ্দার। আর ঐ ঝুম্‌কো-লতায় যেমন গাঁঠে গাঁঠে ফুল ধরেছে, তেমনি তোদের গাঁঠে গাঁঠে বাতে ধ'র্বে।

সর্ব্বনাশ!

সর্দ্দার। আর তোরা সবাই নিজের দাদা হ'য়ে নিজের কান ম'ল্‌তে থাক্‌বি।

সর্ব্বনাশ!

সর্দ্দার। আর—

আর কাজ কি সর্দ্দার! থাক্ বুড়োধরা খেলা! ওটা বরঞ্চ শীতের দিনেই হবে। এবার তোমাকে নিয়েই—

সর্দ্দার। তোদের দেখ্‌চি আগে থাক্‌তেই বুড়োর ছোঁয়াচ লেগেছে।

কেন? কী লক্ষণটা দেখ্‌লে?

সর্দ্দার। উৎসাহ নেই! গোড়াতেই পেছিয়ে গেলি? দেখই না কি হয়!

আচ্ছা, বেশ! রাজি!

চল্‌রে সব চল!

বুড়োর খোঁজে চল্‌!

যেখানে পাই তা'কে পাকা চুলটার মতো পট্‌ করে' উপ্‌ড়ে আন্‌বো।

শুনেছি উপ্‌ড়ে আনার কাজে তা'রই হাত পাকা। নিড়ুনি তা'র প্রধান অস্ত্র।

ভয়ের কথা রাখ্‌। খেল্‌তেই যখন বেরলুম তখন ভয়, চৌপদী, পণ্ডিত, পুঁথি এ-সব ফেলে যেতে হবে।

গান

আমাদের ভয় কাহারে?
বুড়ো বুড়ো চোর ডাকাতে
কী আমাদের ক'র্‌তে পারে?
আমাদের রাস্তা সোজা, নাইকো গলি,
নাইকো ঝুলি, নাইকো থলি,
ওরা আর যা কাড়ে কাড়ুক্‌, মোদের
পাগ্‌লামি কেউ কাড়্‌বে না রে।
আমরা চাইনে আরাম, চাইনে বিরাম,
চাইনে যে ফল, চাইনে রে নাম,
মোরা ওঠায় পড়ায় সমান নাচি,
সমান খেলি জিতে হারে,—
আমাদের ভয় কাহারে?

দ্বিতীয় দৃশ্যের গীতি-ভূমিকা

প্রবীণের দ্বিধা

১

দুরন্ত প্রাণের গান

আমরা খুঁজি খেলার সাথী।
ভোর না হ'তে জাগাই তাদের
ঘুমায় যারা সারারাতি।
আমরা ডাকি পাখীর গলায়,
আমরা নাচি বকুল-তলায়,
মন-ভোলাবার মন্ত্র জানি,
হাওয়াতে ফাঁদ আমরা পাতি।
মরণকে তো মানিনে রে
কালের ফাঁসি ফাঁসিয়ে দিয়ে
লুঠ-করা ধন নিই যে কেড়ে।
আমরা তোমার মনোচোরা,
ছাড়্‌বো না গো তোমায় মোরা,
চলেছো কোন্ আঁধার পানে
সেথাও জ্বলে মোদের বাতি।

২

শীতের বিদায় গান

ছাড়্‌ গো তোরা ছাড়্‌ গো,
আমি চ'ল্‌বো সাগর-পার গো।

বিদায় বেলায় এ কি হাসি,
ধ'র্‌লি আগমনীর বাঁশি।
যাবার সুরে আসার সুরে
ক'র্‌লি একাকার গো।
সবাই আপন পানে
আমায় আবার কেন টানে?
পুরানো শীত পাতা-ঝরা,
তা'রে এমন নূতন-করা?
মাঘ মরিলো ফাগুন হ'য়ে
খেয়ে ফুলের মার গো।

৩

নব যৌবনের গান

আমরা নূতন প্রাণের চর।
আমরা থাকি পথে ঘাটে
নাই আমাদের ঘর।
নিয়ে পক্ক পাতার পুঁজি
পালাবে শীত ভাব্‌চো বুঝি?
ও সব কেড়ে নেবো, উড়িয়ে দেবো
দখিন হাওয়ার পর।
তোমায় বাঁধ্‌বো নূতন ফুলের মালায়
বসন্তের এই বন্দীশালায়।

জীর্ণ জরার ছদ্মরূপে
এড়িয়ে যাবে চুপে চুপে ?
তোমার সকল ভূষণ ঢাকা আছে
নাই যে অগোচর।

৪

উদ্‌ভ্রান্ত শীতের গান

ছাড়্ গো আমায় ছাড়্ গো—
আমি চ'ল্‌বো সাগর-পার গো।
রঙের খেলার, ভাই রে,
আমার সময় হাতে নাই রে।
তোমাদের ঐ সবুজ ফাগে
চক্ষে আমার ধাঁদা লাগে,
আমায় তোদের প্রাণের দাগে
দাগিস্‌নে ভাই আর গো।

দ্বিতীয় দৃশ্য

ঘাট

ওগো ঘাটের মাঝি, ঘাটের মাঝি, দরজা খোলো।

কেন গো, তোমরা কা'কে চাও ?

আমরা বুড়োকে খুঁজ্‌তে বেরিয়েছি।

চন্দ্রহাস। কোন্ বুড়োকে ?

কোন্-বুড়োকে না। বুড়োকে।

তিনি কে ?

চন্দ্রহাস। আহা, আদ্যিকালের বুড়ো।

ওঃ বুঝেছি। তা'কে নিয়ে কর্‌'বে কি ?

বসন্ত-উৎসব ক'র্‌বো।

বুড়োকে নিয়ে বসন্ত-উৎসব ? পাগল হ'য়েছো ?

পাগল হঠাৎ হইনি। গোড়া থেকেই এই দশা।

আর অন্তিম পর্য্যন্তই এই ভাব।

গান

আমাদের ক্ষেপিয়ে বেড়ায় যে
কোথায় লুকিয়ে থাকে রে ?
ছুট্‌লো বেগে ফাগুন হাওয়া
কোন্ ক্ষ্যাপামির নেশায় পাওয়া ?
ঘূর্ণা হাওয়ায় ঘুরিয়ে দিলো সূর্য্যতারাকে ॥

মাঝি। ওহে তোমাদের হাওয়ার জোর আছে—দরজায় ধাক্কা লাগিয়েছে। এখন সেই বুড়োটার খবর দাও।

মাঝি। সেই যে বুড়িটা রাস্তার মোড়ে বসে' চরকা কাটে তা'কে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে হয় না!

জিজ্ঞাসা ক'রেছিলুম—সে বলে, সাম্‌নে দিয়ে কতো ছায়া যায়, কতো ছায়া আসে, কাকেই বা চিনি? ওযে একই জায়গায় ব'সে থাকে ও কারো ঠিকানা জানে না।

মাঝি, তুমি ঘাটে ঘাটে অনেক ঘুরেচো, তুমি নিশ্চয় ব'ল্‌তে পার কোথায় সেই—

মাঝি। ভাই, আমার ব্যবসা হ'চ্চে পথ ঠিক করা—কাদের পথ, কিসের পথ সে আমার জান্‌বার দরকার হয় না। আমার দৌড় ঘাট পর্য্যন্ত,—ঘর পর্য্যন্ত না।

আচ্ছা চলো তো, পথগুলো পরখ করে' দেখা যাক্।

গান

কোন্ ক্ষ্যাপামির তালে নাচে
পাগল সাগরনীর?
সেই তালে যে পা ফেলে' যাই,
রইতে নারি স্থির।
চ'ল্‌রে সোজা, ফেল্‌রে বোঝা,
রেখে দে তোর রাস্তা-খোঁজা,
চলার বেগে পায়ের তলায়
রাস্তা জেগেছে॥

মাঝি। ঐ যে কোটাল আস্‌চে, ওকে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে হয়—আমি পথের খবর জানি, ও পথিকদের খবর জানে।

ওহে কোটাল হে, কোটাল হে!

কোটাল। কে গো, তোমরা কে?

আমাদের যা দেখ্‌চো তাই, পরিচয় দেবার কিছুই নেই।

কোটাল। কি চাই?

চন্দ্রহাস। বুড়োকে খুঁজ্‌তে বেরিয়েচি।

কোটাল। কোন্ বুড়োকে?

সেই চিরকালের বুড়োকে।

কোটাল। এ তোমাদের কেমন খেয়াল? তোমরা খোঁজো তাকে? সেই তো তোমাদের খোঁজ ক'র্‌চে?

চন্দ্রহাস। কেন বলো তো?

কোটাল। সে নিজের হিম রক্তটা গরম করে' নিতে চায়, তপ্ত যৌবনের পরে তা'র বড়ো লোভ।

চন্দ্রহাস। আমরা তা'কে কষে গরম ক'রে দেবো, সে ভাবনা নেই। এখন দেখা পেলে হয়। তুমি তা'কে দেখেচো?

কোটাল। আমার রাতের বেলার পাহারা—দেখি ঢের লোক, চেহারা বুঝিনে। কিন্তু বাপু, তা'কেই সকলে বলে ছেলে-ধরা, উল্টে তোমরা তা'কে ধ'র্‌তে চাও—এটা যে পূরো পাগ্‌লামি।

দেখেচো? ধরা প'ড়েচি। পাগ্‌লামিই তো! চিন্‌তে দেরি হয় না।

কোটাল। আমি কোটাল, পথ-চল্‌তি যাদের দেখি সবাই এক ছাঁচের। তাই অদ্ভুত কিছু দেখ্‌লেই চোকে ঠেকে।

ঐ শোন! পাড়ার ভদ্রলোকমাত্রই ঐ কথা বলে—আমরা অদ্ভুত।

আমরা অদ্ভুত বই কি, কোনো ভুল নেই।

কোটাল। কিন্তু তোমরা ছেলেমানুষি ক'র্‌চো।

ঐরে, আবার ধরা প'ড়েচি। দাদাও ঠিক ঐ কথাই বলে।

অতি প্রাচীন কাল থেকে আমরা ছেলেমানুষিই ক'র্‌চি।

ওতে আমরা একেবারে পাকা হ'য়ে গেছি।

চন্দ্রহাস। আমাদের এক সর্দ্দার আছে, সে ছেলেমানুষিতে প্রবীণ। সে নিজের খেয়ালে এমনি হূহূ ক'রে চ'লেছে যে তা'র বয়েসটা কোন্ পিছনে খসে' প'ড়ে গেছে, হুঁস নেই।

কোটাল। আর তোমরা ?

আমরা সব বয়েসের গুটি-কাটা প্রজাপতি।

কোটাল। (জনান্তিকে মাঝির প্রতি) পাগল রে, একেবারে উন্মাদ পাগল !

মাঝি। বাপু, এখন তোমরা কী ক'র্‌বে ?

চন্দ্রহাস। আমরা যাবো।

কোটাল। কোথায় ?

চন্দ্রহাস। সেটা আমরা ঠিক করিনি।

কোটাল। যাওয়াটাই ঠিক ক'রেচো কিন্তু কোথায় যাবে সেটা ঠিক করোনি ?

চন্দ্রহাস। সেটা চ'ল্‌তে চ'ল্‌তে আপনি ঠিক হ'য়ে যাবে।

কোটাল। তা'র মানে কি হ'লো ?

তা'র মানে হ'চ্চে—

গান

চলি গো, চলি গো, যাই গো চলে'।
পথের প্রদীপ জ্বলে গো
গগন-তলে।
বাজিয়ে চলি পথের বাঁশি,
ছড়িয়ে চলি চলার হাসি,
রঙীন বসন উড়িয়ে চলি
জলে স্থলে।

কোটাল। তোমরা বুঝি কথার জবাব দিতে হ'লে গান গাও?

হাঁ। নইলে ঠিক জবাবটা বেরোয় না। শাদা কথায় ব'ল্‌তে গেলে ভারি অস্পষ্ট হয়, বোঝা যায় না।

কোটাল। তোমাদের বিশ্বাস, তোমাদের গানগুলো খুব পষ্ট।

চন্দ্রহাস। হাঁ, ওতে সুর আছে কি না।

গান

পথিক ভুবন ভালোবাসে
পথিক জনে রে।
এমন সুরে তাই সে ডাকে
ক্ষণে ক্ষণে রে।
চলার পথে আগে আগে
ঋতুর ঋতুর সোহাগ জাগে,
চরণঘায়ে মরণ মরে
পলে পলে।

কোটাল। কোনো সহজ মানুষকে তো কথা ব'ল্‌তে ব'ল্‌তে গান গাইতে শুনি নি।

আবার ধরা পড়ে' গেছিরে, আমরা সহজ মানুষ না।

কোটাল। তোমাদের কোনো কাজকর্ম্ম নেই বুঝি?

না। আমাদের ছুটি।

কোটাল। কেন বলো তো?

চন্দ্রহাস। পাছে সময় নষ্ট হয়।

কোটাল। এটা তো বোঝা গেলো না।

ঐ দেখো—তা হ'লে আবার গান ধ'র্‌তে হ'লো।

কোটাল। না তা'র দরকার নেই। আর বেশি বোঝ্বার আশা রাখিনে।

চন্দ্রহাস। সবাই আমাদের বোঝ্বার আশা ছেড়ে দিয়েছে।

কোটাল। এমন হ'লে তোমাদের চ'ল্বে কি ক'রে ?

চন্দ্রহাস। আর তো কিছুই চ'ল্বার দরকার নেই—শুধু আমরাই চলি।

কোটাল। (মাঝির প্রতি) পাগল রে! উন্মাদ পাগল!

চন্দ্রহাস। এই যে এতক্ষণ পরে দাদা আস্‌চে।

কি দাদা, পিছিয়ে প'ড়েছিলে কেন ?

চন্দ্রহাস। ওরে আমরা চলি উনপঞ্চাশ বায়ুর মতো, আমাদের ভিতরে পদার্থ কিছুই নেই; আর দাদা চলে শ্রাবণের মেঘ—মাঝে মাঝে থম্‌কে দাঁড়িয়ে ভারমোচন ক'র্‌তে হয়। পথের মধ্যে ওকে শ্লোকরচনায় পেয়েছিলো।

দাদা। চন্দ্রহাস, দৈবাৎ তোমার মুখে এই উপমাটি উপাদেয় হ'য়েচে। ওর মধ্যে একটু সার কথা আছে। আমি ওটি চৌপদীতে গেঁথে নিচ্চি।

চন্দ্রহাস। না, না, কথা থাক্ দাদা! আমরা কাজে বেরিয়েছি। তোমার চৌপদীর চার পা, কিন্তু চ'ল্বার বেলা এতো বড়ো খোঁড়া জন্তু জগতে দেখ্‌তে পাওয়া যায় না।

দাদা। আপনি কে ?

আমি ঘাটের মাঝি।

দাদা। আর আপনি ?

আমি পাড়ার কোটাল।

দাদা। তা উত্তম হ'লো—আপনাদের কিছু শোনাতে ইচ্ছা করি। বাজে জিনিস না—কাজের কথা।

মাঝি। বেশ, বেশ। আহা, বলেন, বলেন!

কোটাল। আমাদের গুরু ব'লেছিলেন, ভালো কথা ব'ল্বার লোক অনেক মেলে কিন্তু ভালো কথা যে মরদ খাড়া দাঁড়িয়ে শুন্‌তে পারে তা'কেই সাবাস্! ওটা ভাগ্যের কথা কি না। তা বলো ঠাকুর, বলো!

দাদা। আজ পথে যেতে যেতে দেখ্‌লুম রাজপুরুষ একজন বন্দীকে নিয়ে চ'লেচে! শুন্‌লুম, সে কোনো শ্রেষ্ঠী, তা'র টাকার লোভেই রাজা মিথ্যা ছুতো ক'রে তা'কে ধ'রেচে। শুনে আমি নিকটেই মুদির দোকানে ব'সে এই শ্লোকটি রচনা করেচি। দেখ বাপু, আমি বানিয়ে একটি কথাও লিখিনে। আমি যা লিখ্‌বো রাস্তায় ঘাটে তা মিলিয়ে নিতে পার্‌বে। ঠাকুর, কি লিখেচো শুনি।

দাদা।

আত্মরস লক্ষ্য ছিল বলে'
ইক্ষু মরে ভিক্ষুর কবলে।
ওরে মূর্খ, ইহা দেখি শিক্ষ—
ফল দিয়ে রক্ষা পায় বৃক্ষ।

বুঝেচো? রস জমায় বলেই ইক্ষু বেটা মরে, যে গাছ ফল দেয় তা'কে তো কেউ মারে না!

কোটাল। ওহে মাঝি, খাসা লিখেচে হে!

মাঝি। ভাই কোটাল, কথাটির মধ্যে সার আছে।

কোটাল। শুন্‌লে মানুষের চৈতন্য হয়। আমাদের কায়েতের পো এখানে থাক্‌লে ওটা লিখে নিতুম রে। পাড়ায় খবর পাঠিয়ে দে! সর্ব্বনাশ ক'র্‌লে রে!

চন্দ্রহাস। ও ভাই মাঝি, তুমি যে ব'ল্লে আমাদের সঙ্গে বেরবে, দাদার চৌপদী জ'ম্‌লে তো আর—

মাঝি। আরে রমুন মশায়, পাগ্‌লামি রেখে দিন্। ঠাকুরকে পেয়েছি, দু'টো ভালো কথা শুনে নিই—বয়েস হ'য়ে এলো, কোন্ দিন ম'র্‌বো। ভাই, সেই জন্যেই তো ব'ল্‌চি, আমাদের সঙ্গ পেয়েচো, ছেড়ো না।

চন্দ্রহাস। দাদাকে চিরদিনই পাবে কিন্তু আমরা একবার ম'লে বিধাতা দ্বিতীয়বার আর এমন ভুল ক'র্‌বেন না।

(বাহির হইতে) ওগো, কোটাল, কোটাল, কোটাল !

কেরে। অনাথ কলু দেখ্‌ছি। কি হ'য়েছে ?

সেই যে ছেলেটাকে পুষেছিলুম তা'কে বুঝি কাল রাত্রে ভুলিয়ে নিয়ে গেছে সেই ছেলেধরা।

কোন্ ছেলেধরা ?

সেই বুড়ো।

চন্দ্রহাস। বুড়ো ? বলিস্ কিরে ?

আপনারা অতো খুসি হন কেন ?

ওটা আমাদের একটা বিশ্রী স্বভাব। আমরা খামকা খুসি হ'য়ে উঠি !

কোটাল। পাগল ! একেবারে উন্মাদ পাগল !

চন্দ্রহাস। তা'কে তুমি দেখেচো হে ?

কলু। বোধ হয় কাল রাত্রে তা'কেই দূর থেকে দেখেছিলুম।

কি রকম চেহারাটা ?

কলু। কালো, আমাদের এই কোটাল দাদার চেয়েও। একেবারে রাত্রের সঙ্গে মিশিয়ে গেছে। আর বুকে দু'টো চক্ষু জোনাক পোকার মতো জ্ব'ল্‌চে।

ওহে বসন্ত-উৎসবে তো মানাবে না।

চন্দ্রহাস। ভাবনা কি ? তেমন যদি দেখি তবে এবার না হয় পূর্ণিমায় উৎসব না ক'রে অমাবস্যায় করা যাবে।

অমাবস্যার বুকে তো চোখের অভাব নেই।

কোটাল। ওহে বাপু, তোমরা ভালো কাজ ক'র্‌চো না।

না, আমরা ভালো কাজ ক'র্‌চিনে।

আবার ধরা প'ড়েচি রে, আমরা ভালো কাজ ক'র্‌চিনে। কি ক'র্‌বো, অভ্যাস নেই।

যেহেতু আমরা ভালমানুষ নই।

কোটাল। একি ঠাট্টা পেয়েচো? এতে বিপদ আছে।

বিপদ? সেইটেই তো ঠাট্টা।

গান

ভালোমানুষ নইরে মোরা
ভালোমানুষ নই।
গুণের মধ্যে ঐ আমাদের
গুণের মধ্যে ঐ।
দেশে দেশে নিন্দে রটে,
পদে পদে বিপদ ঘটে,
পুঁথির কথা কইনে মোরা
উল্টো কথা কই॥

কোটাল। ওহে বাপু, তোমরা যে কোন্ সর্দ্দারের কথা ব'ল্‌ছিলে সে গেল কোথায়? সে সঙ্গে থাক্‌লে যে তোমাদের সাম্‌লাতে পার্‌তো।

সে সঙ্গে থাকে না পাছে সাম্‌লাতে হয়।

সে আমাদের পথে বের ক'রে দিয়ে নিজে স'রে দাঁড়ায়।

কোটাল। এ তা'র কেমনতর সর্দ্দারি?

চন্দ্রহাস। সর্দ্দারি করে না বলেই তা'কে সর্দ্দার ক'রেচি।

কোটাল। দিব্যি সহজ কাজটি তো সে পেয়েচে।

চন্দ্রহাস। না ভাই, সর্দ্দারি করা সহজ, সর্দ্দার হওয়া সহজ নয়।

গান

জন্ম মোদের ত্র্যহস্পর্শে,
সকল অনাসৃষ্টি।
ছুটি নিলেন বৃহস্পতি,
রইলো শনির দৃষ্টি।

অযাত্রাতে নৌকো ভাসা,
রাখিনে ভাই ফলের আশা,
আমাদের আর নাই যে গতি
ভেসেই চলা বই॥

দাদা, চলো তবে, বেরিয়ে পড়ি।

কোটাল। না, না ঠাকুর, ওদের সঙ্গে কোথায় ম'র্‌তে যাবে?

মাঝি। তুমি আমাদের শোলোক শোনাও, পাড়ার মানুষ সব এলো বলে'! এ সব কথা শোনা ভালো!

দাদা। না ভাই, এখান থেকে আমি ন'ড়্‌চিনে।

তাহ'লে আমরা নড়ি। পাড়ার মানুষ আমাদের সইতে পারে না।

পাড়াকে আমরা নাড়া দিই পাড়া আমাদের তাড়া দেয়। ঐ যে চৌপদীর গন্ধ পেয়েছে, মৌমাছির গুঞ্জন শোনা যাচ্চে।

পাড়ার লোক। ওরে মাঝির এখানে পাঠ হবে।

কে গো? তোমরাই পাঠ ক'র্‌বে নাকি?

আমরা অন্য অনেক অসহ্য উৎপাত করি কিন্তু পাঠ করিনে।

ঐ পুণ্যের জোরেই আমরা রক্ষা পাবো।

এরা বলে কিরে? হেঁয়ালি না কি?

চন্দ্রহাস। আমরা যা নিজে বুঝি তাই বলি; হঠাৎ হেঁয়ালি বলে' ভ্রম হয়। আর তোমরা যা খুবই বোঝ দাদা তাই তোমাদের বুঝিয়ে ব'ল্‌বে, হঠাৎ গভীর জ্ঞানের কথা বলে' মনে হবে।

(একজন বালকের প্রবেশ)

আমি পার্‌লুম না। কিছুতে তা'কে ধ'র্‌তে পার্‌লুম না।

কা'কে ভাই?

ঐ তোমরা যে বুড়োর খোঁজ ক'রেছিলে, তা'কে।

তা'কে দেখেচো না কি ?

সে বোধ হয় রথে চ'ড়ে গেলো।

কোন্ দিকে ?

কিছুই ঠাউরাতে পার্‌লুম না। কিন্তু তা'র চাকার ঘূর্ণিহাওয়ায় এখনো ধূলা উড়্‌চে।

চল্, তবে চল্।

শুক্‌নো পাতায় আকাশ ছেয়ে দিয়ে গেছে। (প্রস্থান)

কোটাল। পাগল ! উন্মাদ পাগল !

তৃতীয় দৃশ্যের গীতি-ভূমিকা

প্রবীণের পরাভব

বসন্তের হাসির গান

ওর ভাব দেখে যে পায় হাসি। হায় হায় রে !

মরণ-আয়োজনের মাঝে

বসে' আছেন কিসের কাজে

প্রবীণ প্রাচীন প্রবাসী। হায় হায় রে।

এবার দেশে যাবার দিনে

আপনাকে ও নিক্ না চিনে,

সবাই মিলে সাজাও ওকে

নবীন রূপের সন্ন্যাসী। হায় হায় রে।

এবার ওকে মজিয়ে দেরে

হিসাব ভুলের বিষম ফেরে।

কেড়েনে ওর থলি থালি,
আয় রে নিয়ে ফুলের ডালি,
গোপন প্রাণের পাগ্‌লাকে ওর
বাইরে দে আজ প্রকাশি। হায় হায় রে!

২

আসন্ন মিলনের গান

আর নাই যে দেরি, নাই যে দেরি।
সাম্‌নে সবার পড়্'লো ধরা
তুমি যে ভাই আমাদেরি।
হিমের বাহু-বাঁধন টুটি
পাগ্‌লা ঝোরা পাবে ছুটি,
উত্তরে এই হাওয়া তোমার
বইবে উজান কুঞ্জ ঘেরি!
আর নাই যে দেরি, নাই যে দেরি।
শুন্‌চো না কি জলে স্থলে
যাদুকরের বাজ্‌লো ভেরী।
দেখ্‌চো না কি এই আলোকে
খেল্‌চে হাসি রবির চোখে,
শাদা তোমার শ্যামল হবে
ফির্‌বো মোরা তাই যে হেরি॥

তৃতীয় দৃশ্য

মাঠ

সবাই বলে ঐ, ঐ, ঐ,—তা'র পরে চেয়ে দেখ্‌লেই দেখা যায়, শুধু ধূলো আর শুক্‌নো পাতা।

তা'র রথের ধ্বজাটা মেঘের মধ্যে যেন একবার দেখা দিয়েছিলো।

কিন্তু দিক্ ভুল হ'য়ে যায়। এই ভাবি পূবে, এই ভাবি পশ্চিমে।

এমনি করে' সমস্ত দিন ধূলো আর ছায়ার পিছনে ঘুরে ঘুরেই হয়রান হ'য়ে গেলুম।

বেলা যে গেল রে ভাই, বেলা যে গেল।

সত্যি কথা বলি, যতোই বেলা যাচ্চে ততোই মনে ভয় ঢুক্‌চে।

মনে হ'চ্চে ভুল ক'রেছি।

সকাল বেলাকার আলো কানে কানে ব'ল্লে, সাবাস্, এগিয়ে চলো,—বিকেল বেলাকার আলো তাই নিয়ে ভারি ঠাট্টা ক'র্‌চে।

ঠক্‌লুম বুঝি রে!

দাদার চৌপদীগুলোর উপরে ক্রমে শ্রদ্ধা বাড়্‌চে।

ভয় হ'চ্চে আমরাও চৌপদী লিখ্‌তে ব'সে যাবো—বড়ো দেরি নেই!

আর পাড়ার লোক আমাদের ঘিরে ব'স্‌বে।

আর এমনি তাদের ভয়ানক উপকার হ'তে থাক্‌বে যে, তা'রা এক পা ন'ড়্‌বে না।

আমরা রাত্রি বেলাকার পাথরের মতো ঠাণ্ডা হ'য়ে বসে' থাক্‌বো।

ও ভাই, আমাদের সর্দ্দার এসব কথা শুন্‌লে ব'ল্‌বে কি?

ওরে আমার ক্রমে বিশ্বাস হ'চ্চে সর্দ্দারই আমাদের ঠকিয়েছে। সে আমাদের মিথ্যে ফাঁকি দিয়ে খাটিয়ে নেয়, নিজে সে কুঁড়ের সর্দ্দার।

ফিরে চল্ রে। এবার সর্দ্দারের সঙ্গে ল'ড়্বো।

ব'ল্‌বো, আমরা চ'ল্‌বো না—তুই পা কাঁধের উপর মুড়ে ব'স্‌বো। পা দু'টো লক্ষ্মীছাড়া, পথে পথেই ঘুরে ম'র্‌লো। হাত দু'টোকে পিছনের দিকে বেঁধে রাখ্‌বো।

পিছনের কোনো বালাই নেইরে, যতো মুস্কিল এই সামনেটাকে নিয়ে।

শরীরে যতোগুলো অঙ্গ আছে তা'র মধ্যে পিঠটাই সত্যি কথা বলে। সে বলে চিৎ হ'য়ে পড়্, চিৎ হ'য়ে পড়্!

কাঁচা বয়সে বুকটা বুক ফুলিয়ে চলে, কিন্তু পরিণামে সেই পিঠের উপরেই ভর—পড়্তেই হয় চিৎ হ'য়ে।

গোড়াতেই যদি চিৎপাত দিয়ে সুরু করা যেতো, তাহ'লে মাঝখানে উৎপাত থাক্‌তো না রে।

আমাদের গ্রামের ছায়ার নীচে দিয়ে সেই যে ইরা নদী ব'য়ে চ'লেছে তা'র কথা মনে প'ড়্‌চে ভাই।

সেদিন মনে হ'য়েছিল, সে ব'ল্‌চে, চল্, চল্, চল্,—আজ মনে হ'চ্চে ভুল শুনেছিলুম, সে ব'ল্‌ছে ছল, ছল, ছল,! সংসারটা সবই ছল রে!

সে কথা আমাদের পণ্ডিত গোঁড়াতেই ব'লেছিলো।

এবারে ফিরে গিয়েই একেবারে সোজা সেই পণ্ডিতের চণ্ডিমণ্ডপে।

পুঁথি ছাড়া আর এক পা চলা নয়?

কি ভুলটাই ক'রেছিলুম! ভেবেছিলুম চলাটাই বাহাদুরি! কিন্তু না চলাই যে গ্রহ নক্ষত্র জল হাওয়া সমস্তর উল্টো। সেটাই তে তেজের কথা হ'লো।

ওরে বীর, কোমর বাঁধ্ রে—আমরা চ'ল্‌বো না।

ওরে পালোয়ান, তাল ঠুকে বসে' পড়্, আমরা চ'ল্‌বো না।

চলচ্চিত্তং চলদ্বিত্তং—আমাদের চিত্তেও কাজ নেই, বিত্তেও কাজ নেই আমরা চ'ল্‌বো না।

চলজ্জীবন-যৌবনং—আমাদের জীবনও থাক্, যৌবনও থাক্; আমর চ'ল্‌বো না।

যেখান থেকে যাত্রা স্বরু ক'রেছি ফিরে চল্।

না রে সেখানে ফির্‌তে হ'লেও চ'ল্‌তে হবে।

তবে ?

তবে আর কি ? যেখানে এসে প'ড়েছি এইখানেই বসে' পড়ি !

মনে করি এইখানেই বরাবর বসে' আছি।

জন্মাবার ঢের আগে থেকে।

মরার ঢের পরে পর্য্যন্ত।

ঠিক্ ব'লেছিস্, তাহ'লে মনটা স্থির থাক্‌বে। আর-কোথাও থেকে এসেছি জান্‌লেই আর-কোথাও যাবার জন্যে মন ছট্‌ফট্ করে।

আর-কোথাওটা বড় সর্ব্বনেশে দেশ রে !

সেখানে দেশটা সুদ্ধ চলে। তা'র পথগুলো চলে। কিন্তু আমরা—

গান

মোরা চ'ল্‌বো না
মুকুল ঝরে ঝরুক্,
মোরা ফ'ল্‌বো না।
সূর্য্য-তারা আগুন ভুগে
জ্বলে' মরুক্ যুগে যুগে,
আমরা যতই পাই না জ্বালা
জ্ব'ল্‌বো না।

বনের শাখা কথা বলে,
কথা জাগে সাগর জলে,
এই ভুবনে আমরা কিছুই
ব'ল্‌বো না!
কোথা হ'তে লাগে রে টান,
জীবনজলে ডাকে রে বান,
আমরা তো এই প্রাণের টলায়
ট'ল্‌বো না॥

ওরে হাসিরে, হাসি!
ঐ হাসি শোনা যাচ্চে।
বাঁচা গেলো, এতক্ষণে একটা হাসি শোনা গেলো!
যেন গুমন্টের ঘোম্‌টা খুলে গেলো।
এ যেন বৈশাখের এক পস্‌লা বৃষ্টি!
কার হাসি ভাই?
শুনেই বুঝ্‌তে পার্‌চিস্‌নে, আমাদের চন্দ্রহাসের হাসি।
কি আশ্চর্য্য হাসি ওর?
যেন ঝরনার মতো, কালো পাথরটাকে ঠেলে নিয়ে চলে।
যেন সূর্য্যের আলো, কুয়াশার তাড়কা রাক্ষসীকে তলোয়ার দিয়ে টুক্‌রো টুক্‌রো করে' কাটে।
যাক্‌ আমাদের চৌপদীর ফাঁড়া কাট্‌লো! এবার উঠে পড়ো।
এবার কাজ ছাড়া কথা নেই—চরাচরমিদং সর্ব্বং কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি।
ও আবার কী রকম কথা হ'লো? ঈশানকে এখনো চৌপদীর ভূত ছাড়েনি!
কীর্ত্তি? নদী কি নিজের ফেনাকে গ্রাহ্য করে? কীর্ত্তি তো আমাদের ফেনা—ছড়াতে ছড়াতে চলে' যাবো। ফিরে তাকাবো না।

এসো ভাই চন্দ্রহাস, এসো, তোমার হাসিমুখ যে!

চন্দ্রহাস। বুড়োর রাস্তার সন্ধান পেয়েছি।

কা'র কাছ থেকে?

চন্দ্রহাস। এই বাউলের কাছ থেকে।

ওকি? ও যে অন্ধ।

চন্দ্রহাস। সেই জন্যে ওকে রাস্তা খুঁজ্‌তে হয় না, ও ভিতর থেকে দেখ্‌তে পায়।

কি হে ভাই, ঠিক্ নিয়ে যেতে পার্‌বে তো?

বাউল। ঠিক্ নিয়ে যাব।

কেমন করে'?

বাউল। আমি যে পায়ের শব্দ শুন্‌তে পাই।

কান তো আমাদেরও আছে, কিন্তু—

বাউল। আমি যে সব-দিয়ে শুনি—শুধু কান-দিয়ে না।

চন্দ্রহাস। রাস্তায় যাকে জিজ্ঞাসা করি, বুড়োর কথা শুন্‌লেই আৎকে ওঠে, কেবল দেখি এরই ভয় নেই।

ও বোধ হয় চোখে দেখ্‌তে পায় না বলেই ভয় করে না।

বাউল। না গো, আমি কেন ভয় করিনে বলি। একদিন আমার দৃষ্টি ছিলো। যখন অন্ধ হলুম ভয় হ'লো দৃষ্টি বুঝি হারালুম। কিন্তু চোখ-ওয়ালার দৃষ্টি অস্ত যেতেই অন্ধের দৃষ্টির উদয় হ'লো। সূর্য্য যখন গেলো তখন দেখি অন্ধকারের বুকের মধ্যে আলো। সেই অবধি অন্ধকারকে আমার আর ভয় নেই।

তাহ'লে এখন চলো। ঐ তো সন্ধ্যাতারা উঠেছে।

বাউল। আমি গান গাইতে গাইতে যাই, তোমরা আমার পিছনে পিছনে এসো! গান না গাইলে আমি রাস্তা পাইনে!

সে কি কথা হে?

বাউল। আমার গান আমাকে ছাড়িয়ে যায়—সে এগিয়ে চলে, আমি পিছনে চলি।

গান

ধীরে বন্ধু, ধীরে ধীরে
চলো তোমার বিজন মন্দিরে।
জানিনে পথ, নাই যে আলো,
ভিতর বাহির কালোয় কালো,
তোমার চরণশব্দ বরণ ক'রেছি
আজ এই অরণ্য গভীরে।
ধীরে বন্ধু, ধীরে ধীরে।
চলো অন্ধকারের তীরে তীরে।
চ'লবো আমি নিশীথরাতে
তোমার হাওয়ার ইসারাতে,
তোমার বসনগন্ধ বরণ ক'রেছি
আজ এই বসন্ত সমীরে॥

চতুর্থ দৃশ্যের গীতি-ভূমিকা

নবীনের জয়

১

প্রত্যাগত যৌবনের গান

বিদায় নিয়ে গিয়েছিলেম
বারে বারে।
ভেবেছিলেম ফিরবো না রে।

এই তো আবার নবীন বেশে
এলেম তোমার হৃদয়-দ্বারে।
কেগো তুমি ?—আমি বকুল ;
কেগো তুমি ?—আমি পারুল ;
তোমরা কে বা ?—আমরা আমের মুকুল গো
এলেম আবার আলোর পারে।
এবার যখন ঝ'র্‌বো মোরা
ধরার বুকে
ঝ'র্‌বো তখন হাসিমুখে !
অফুরানের আঁচল ভরে'
ম'র্‌বো মোরা প্রাণের সুখে।
তুমি কে গো ?—আমি শিমুল ;
তুমি কে গো ?—কামিনী ফুল ;
তোমরা কে বা—আমরা নবীন পাতা গো
শালের বনে ভারে ভারে ॥

২

নূতন আশার গান

এই কথাটাই ছিলেম ভুলে—
মিল্‌বো আবার সবার সাথে
ফাল্গুনের এই ফুলে ফুলে।
অশোক বনে আমার হিয়া
নূতন পাতায় উঠ্‌বে জিয়া,

বুকের মাতন টুটবে বাঁধন
যৌবনেরি কূলে কূলে।
ফাল্গুনের এই ফুলে ফুলে।
বাঁশিতে গান উঠ্‌বে পূরে
নবীন রবির বাণী-ভরা
আকাশবীণার সোনার সুরে।
আমার মনের সকল কোণে
ভর্‌বে গগন আলোক-ধনে,
কান্নাহাসির বন্যারি নীর
উঠ্‌বে আবার দু'লে দু'লে
ফাল্গুনের এই ফুলে ফুলে॥

৩

বোঝাপাড়ার গান

এবার তো যৌবনের কাছে
মেনেছো, হার মেনেছো?
মেনেছি।
আপন মাঝে নূতনকে আজ জেনেছো?
জেনেছি।
আবরণকে বরণ করে'
ছিলে কাহার জীর্ণ ঘরে!
আপনাকে আজ বাহির ক'রে এনেছো?
এনেছি।

এবার আপন প্রাণের কাছে
মেনেছো, হার মেনেছো ?
মেনেছি।
মরণ মাঝে অমৃতকে জেনেছো ?
জেনেছি।
লুকিয়ে তোমার অমরপুরী
ধূলা-অসুর করে চুরি,
তাহারে আজ মরণ আঘাত হেনেছো ?
হেনেছি ॥

৪

নবীন রূপের গান

এতদিন যে ব'সেছিলেম
পথ চেয়ে আর কাল গুণে',
দেখা পেলেম ফাল্গুনে।
বালক-বীরের বেশে তুমি ক'র্‌লে বিশ্বজয়—
এ কি গো বিস্ময়!
অবাক্ আমি তরুণ গলার
গান শুনে।
গন্ধে উদাস হাওয়ার মতো
উড়ে তোমার উত্তরী,
কর্ণে তোমার কৃষ্ণচূড়ার মঞ্জরী।

তরুণ হাসির আড়ালে কোন্
আগুন ঢাকা রয়—
এ কি গো বিস্ময়!
অস্ত্র তোমার গোপন রাখ
কোন্ তূণে!

প্রকাশ

চতুর্থ দৃশ্য

গুহার দ্বার

দেখ দেখি ভাই, আবার আমাদের ফেলে রেখে চন্দ্রহাস কোথায় গেলো!
ওকে কি ধরে' রাখ্‌বার জো আছে?
বসে' বিশ্রাম করি আমরা, ও চলে' বিশ্রাম করে।
অন্ধ বাউলকে নিয়ে সে নদীর ওপারে চলে' গেছে।
আর কিছু নয়, ঐ অন্ধের অন্ধতার মধ্যে সেঁধিয়ে গিয়ে তবে ছাড়্‌বে।
তাই আমাদের সর্দ্দার ওকে ডুবুরি বলে।
চন্দ্রহাস একটু সরে' গেলেই আর আমাদের খেলার রস থাকে না।
ও কাছে থাক্‌লে মনে হয়, কিছু হোক্ বা না হোক্, তবু মজা আছে। এমন কি, বিপদের আশঙ্কা থাক্‌লে মনে হয় সে আরো বেশি মজা।
আজ এই রাত্রে ওর জন্যে মনটা কেমন ক'র্‌চে।
দেখ্‌চিস্ এখানকার হাওয়াটা কেমনতর?

এখানে আকাশটা যেন যাবার বেলাকার বন্ধুর মতো মুখের দিকে তাকিয়ে আছে।

যারা সেখানে ব'ল্‌ছিলো "চল্ চল্", তা'রা এখানে ব'ল্‌চে "যাই যাই।"

কথাটা একই, সুরটা আলাদা।

মনটার ভিতরে কেমন ব্যথা দিচ্চে, তবু লাগ্‌ছে ভালো।

ঝাউগাছের বীথিকার ভিতর দিয়ে কোথা থেকে এই একটা নদীর স্রোত চলে' আস্‌চে, এ যেন কোন্ দুপুররাতের চোখের জল।

পৃথিবীর দিকে এমন করে' কখনো আমরা দেখিনি।

ঊর্দ্ধশ্বাসে যখন সাম্‌নে ছুটি তখন সাম্‌নের দিকেই চোখ থাকে, চারপাশের দিকে নয়।

বিদায়ের বাঁশিতে যখন কোমল ধৈবত লাগে তখনি সকলের দিকে চোখ মেলি।

আর দেখি বড়ো মধুর। যদি সবাই চলে' চলে' না যেতো তাহ'লে কি কোনো মাধুরী চোখে প'ড়্‌তো?

চলার মধ্যে যদি কেবলি তেজ থাক্‌তো তাহ'লে যৌবন শুকিয়ে যেতো। তা'র মধ্যে কান্না আছে তাই যৌবনকে সবুজ দেখি।

এই জায়গাটাতে এসে শুন্‌তে পাচ্চি জগৎটা কেবল "পাবো" "পাবো" ব'ল্‌চে না—সঙ্গে সঙ্গেই ব'ল্‌চে, "ছাড়্‌বো, ছাড়্‌বো।"

সৃষ্টির গোধূলিলগ্নে "পাবো"র সঙ্গে "ছাড়্‌বো"র বিয়ে হ'য়ে গেছে রে—তাদের মিল ভাঙ্‌লেই সব ভেঙে যাবে।

অন্ধ বাউল আমাদের এ কোন্ দেশে আন্‌লে ভাই?

ঐ তারাগুলোর দিকে তাকাচ্চি আর মনে হ'চ্চে যুগে যুগে যাদের ফেলে এসেছি' তাদের অনিমেষ দৃষ্টিতে সমস্ত রাত একেবারে ছেয়ে র'য়েচে।

ফুলগুলোর মধ্যে কা'রা ব'ল্‌চে "মনে রেখো, মনে রেখো", তাদের নাম তো মনে নেই কিন্তু মন যে উদাস হ'য়ে ওঠে।

একটা গান না গাইলে বুক ফেটে যাবে।

গান

ই ফেলে এসেছিস্ কারে ? (মন, মন রে আমার)

াই জনম গেলো, শান্তি পেলিনারে ! (মন, মন রে আমার)

যে পথ দিয়ে চলে' এলি

সে পথ এখন ভুলে গেলি,

কমন ক'রে' ফির্‌বি তাহার দ্বারে ? (মন, মন রে আমার)

নদীর জলে থাকি রে কান পেতে,

কাঁপে যে প্রাণ পাতার মর্ম্মরেতে।

মনে হয় রে পাবো খুঁজি

ফুলের ভাষা যদি বুঝি,

য পথ গেছে সন্ধ্যাতারার পারে। (মন, মন রে আমার)

এবার আমাদের বসন্ত-উৎসবে এ কী রকম স্থর লাগ্‌চে ?

এ যেন ঝরা পাতার স্থর।

এতদিন বসন্ত তা'র চোখের জলটা আমাদের কাছে লুকিয়ে ছিলো।

ভেবেছিলো আমরা বুঝ্‌তে পার্‌বো না, আমরা যে যৌবনে দুরন্ত।

আমাদের কেবল হাসি দিয়ে ভুলোতে চেয়েছিলো !

কিন্তু আজ আমরা আমাদের মনকে মজিয়ে নেবো এই সমুদ্রপারের দীর্ঘনিশ্বাসে !

প্রিয়া, এই পৃথিবী আমাদের প্রিয়া। এই স্থন্দরী পৃথিবী। সে চাচ্চে আমাদের যা আছে সমস্তই—আমাদের হাতের স্পর্শ, আমাদের হৃদয়ের গান—

চাচ্চে যা আমাদের আপনার মধ্যে আপনার কাছ থেকেও লুকিয়ে আছে।

ওযে কিছু পায় কিছু পায় না, এই জন্যেই ওর কান্না। পেতে পেতে সবই
হারিয়ে যায়।
ওগো পৃথিবী, তোমাকে আমরা ফাঁকি দেবো না!

গান

আমি যাবো না গো অম্‌নি চলে'।
মালা তোমার দেবো গলে।
অনেক সুখে অনেক দুখে
তোমার বাণী নিলেম বুকে,
ফাগুন শেষে যাবার বেলা
আমার বাণী যাবো বলে'।
কিছু হ'লো, অনেক বাকি;
ক্ষমা আমায় ক'র্‌বে না কি?
গান এসেচে সুর আসে নাই
হ'লো না যে শোনানো তাই,
সে সুর আমার রইলো ঢাকা
নয়নজলে নয়নজলে॥

ও ভাই, কে যেন গেল বোধ হ'চ্চে।
আরে, গেলো, গেলো, গেলো, এ ছাড়া আর তো কিছুই বোধ হ'চ্চে না।
আমার গায়ের উপর কোন্ পথিকের কাপড় ঠেকে গেলো!
নিয়ে চলো পথিক, নিয়ে চলো তোমার সঙ্গে, হাওয়া যেমন ফুলের গন্ধ
নিয়ে যায়।
কা'কে ধরে' আন্‌বার জন্যে বেরিয়েছিলুম, কিন্তু ধরা দেবার জন্যেই মন
আকুল হ'লো।

(বাউলের প্রবেশ)

এই যে আমাদের বাউল। আমাদের এ কোথায় এনেচো, এখানে সমস্ত পথিকজগতের নিশ্বাস আমাদের গায়ে লাগ্‌চে—সমস্ত তারাগুলোর!

আমরা খেলাচ্ছলে বেরিয়েছিলুম, কিন্তু খেলাটা যে কি তা ভুলেই গেছি।

আমরা তা'কেই ধ'র্‌তে বেরিয়েছিলুম পৃথিবীর মধ্যে যে বুড়ো।

রাস্তার সবাই বল্লে সে ভয়ঙ্কর। সে কেবলমাত্র একটা মুণ্ড, একটা হাঁ, যৌবনের চাঁদকে গিলে খাবার জন্যেই তা'র একমাত্র লোভ।

কিন্তু ভয় ভেঙে গেছে। মনের ভিতর ব'ল্‌চে সে যদি আমাকে চায় তবে আমিও বসে' থাক্‌বো না। ফুল যাচ্চে, পাতা যাচ্চে, নদীর জল যাচ্চে—তা'র পিছন পিছন আমিও যাবো।

ও ভাই বাউল, তোমার একতারাতে একটা সুর লাগাও! রাত কতো হ'লো কে জানে? হয় তো বা ভোর হ'য়ে এলো।

বাউলের গান

সবাই যারে সব দিতেছে
তা'র কাছে সব দিয়ে ফেলি।
ক'বার আগে চা'বার আগে
আপনি আমায় দেবো মেলি।
নেবার বেলা হ'লেম ঋণী,
ভিড় ক'রেছি, ভয় করিনি,
এখনো ভয় ক'র্‌বো নারে,
দেবার খেলা এবার খেলি।
প্রভাত তারি সোনা নিয়ে
বেরিয়ে পড়ে নেচে কুঁদে।

সন্ধ্যা তা'রে প্রণাম করে
সব সোনা তা'র দেয়রে শুধে।
ফোটা ফুলের আনন্দ রে
ঝরা ফুলেই ফলে ধরে,
আপ্‌নাকে ভাই ফুরিয়ে-দেওয়া
চুকিয়ে দে তুই বেলাবেলি॥

ওহে বাউল, চন্দ্রহাস এখনো এলো না কেন?

বাউল। সে যে গেছে, তা জান না?

গেছে? কোথায় গেছে?

বাউল। সে বল্লে, আমি তা'কে জয় করে' আন্‌বো।

কা'কে?

বাউল। যাকে সবাই ভয় করে। সে বল্লে, নইলে আমার কিসের যৌবন!

বাঃ এ তো বেশ কথা! দাদা গেলো পাড়ার লোককে চৌপদী শোনাতে, আর চন্দ্রহাস কোথায় গেলো ঠিকানাই নেই!

বাউল। সে বল্লে, যুগে যুগে মানুষ লড়াই ক'রেছে, আজ বসন্তের হাওয়ায় তারি ঢেউ!

তারি ঢেউ?

বাউল। হাঁ। খবর এসেচে মানুষের লড়াই শেষ হয় নি।

বসন্তের এই কি খবর?

বাউল। যারা মরে' অমর বসন্তের কচি পাতায় তা'রাই পত্র পাঠিয়েছে। দিগ্‌দিগন্তে তা'রা রটাচ্চে—"আমরা পথের বিচার করিনি—আমরা পাথেয়ের হিসাব রাখিনি—আমরা ছুটে এসেচি, আমরা ফুটে বেরিয়েচি। আমরা যদি ভাব্‌তে ব'স্‌তুম তাহ'লে বসন্তের দশা কি হ'তো?"

চন্দ্রহাস তাই বুঝি ক্ষেপে উঠেচে?

বাউল। সে বল্লে—

গান

বসন্তে ফুল গাঁথ্‌লো আমার
জয়ের মালা।
বইলো প্রাণে দখিন হাওয়া
আগুন-জ্বালা।
পিছের বাঁশি কোণের ঘরে
মিছেরে ঐ কেঁদে মরে,
মরণ এবার আন্‌লো আমার
বরণ-ডালা।
যৌবনেরি ঝড় উঠেছে
আকাশ পাতালে।
নাচের তালের ঝঙ্কারে তা'র
আমায় মাতালে।
কুড়িয়ে নেবার ঘুচ্‌লো পেশা,
উড়িয়ে দেবার লাগ্‌লো নেশা,
আরাম বলে, "এলো আমার
যাবার পালা।"

কিন্তু সে গেলো কোথায়?

বাউল। সে বল্লে, আমি পথ চেয়ে চুপ করে' বসে' থাকৃতে পার্‌বো না। আমি এগিয়ে গিয়ে ধ'র্‌বো। আমি জয় করে' আন্‌বো।

কিন্তু গেলো কোন্ দিকে?

বাউল। সেই গুহার মধ্যে চলে' গেছে।

সে কি কথা? সে যে ঘোর অন্ধকার!

কোনো খবর না নিয়েই একেবারে—

বাউল। সে নিজেই খবর নিতে গেছে।

ফিরবে কখন?

তুইও যেমন? সে কি আর ফিরবে?

কিন্তু চন্দ্রহাস গেলে আমাদের জীবনের রইলো কি?

আমাদের সর্দ্দারের কাছে কী জবাব দেবো?

এবার সর্দ্দারও আমাদের ছাড়্‌বে।

যাবার সময় আমাদের কী বলে' গেলো সে?

বাউল। বল্লে' আমার জন্যে অপেক্ষা কোরো, আমি আবার ফিরে আস্‌বো।

ফিরে আস্‌বে? কেমন করে' জান্‌বো?

বাউল। সে তো বল্লে, আমি জয়ী হ'য়ে ফিরে আস্‌বো।

তাহ'লে আমরা সমস্ত রাত অপেক্ষা করে' থাক্‌বো।

বাউল, কোথায় আমাদের অপেক্ষা ক'র্‌তে হবে?

বাউল। এই যে গুহার ভিতর থেকে নদীর জল বেরিয়ে আস্‌চে এরি মুখের কাছে।

ঐ গুহায় কোন্‌ রাস্তা দিয়ে গেলো? ওখানে যে কালো খাঁড়ার মতো অন্ধকার!

বাউল। রাত্রের পাখীগুলোর ডানার শব্দ ধরে' গেছে।

তুমি সঙ্গে গেলে না কেন?

বাউল। আমাকে তোমাদের আশ্বাস দেবার জন্যে রেখে গেলো।

কখন্‌ গেছে বলো তো?

বাউল। অনেকক্ষণ—রাতের প্রথম প্রহরেই।

এখন বোধ হয় তিন প্রহর পেরিয়ে গেছে। কেমন এক ঠাণ্ডা হাওয়া দিয়েছে—গা সির্‌ সির্‌ ক'র্‌চে।

দেখ ভাই, স্বপ্ন দেখেছি যেন তিন জন মেয়ে মানুষ চুল এলিয়ে দিয়ে—

তোর স্বপ্নের কথা রেখে দে! ভালো লাগ্‌চে না!

সব লক্ষণগুলো কেমন খারাপ ঠেক্‌চে।

প্যাঁচাটা ডাক্‌ছিলো, এতক্ষণ কিছু মনে হয়নি—কিন্তু—মাঠের ওপারে কুকুরটা কি রকম বিশ্রী স্বরে চ্যাঁচাচ্ছে শুন্‌ছিস্!

ঠিক যেন তা'র পিঠের উপর ডাইনি সওয়ার হ'য়ে তা'কে চাব্‌কাচ্ছে।

যদি ফের্‌বার হ'তো চন্দ্রহাস এতক্ষণে ফির্‌তো।

রাত্‌টা কেটে গেলে বাঁচা যায়!

শোন্ রে ভাই মেয়েমানুষের কান্না!

ওরা তো কাঁদ্‌চেই—কেবল কাঁদ্‌চেই, অথচ কাউকে ধরে' রাখ্‌তে পার্‌চে না।

নাঃ আর পারা যায় না—চুপ করে' বসে' থাক্‌লেই যতো কুলক্ষণ দেখা যায়।

চলো আমরাও যাই—পথ চল্লেই ভয় থাকে না!

পথ দেখাবে কে?

ঐ যে বাউল আছে।

কি হে, তুমি পথ দেখাতে পারো?

বাউল। পারি।

বিশ্বাস ক'র্‌তে সাহস হয় না। তুমি চোখে না দেখে পথ বের করো শুধু গান গেয়ে?

তুমি চন্দ্রহাসকে কী রাস্তা দেখিয়ে দিলে! যদি সে ফিরে আসে তবে তোমাকে বিশ্বাস ক'র্‌বো।

ফিরে যদি না আসে তাহ'লে কিন্তু—

চন্দ্রহাসকে যে আমরা এতো ভালবাস্‌তুম তা জান্‌তুম না।

এতোদিন ওকে নিয়ে আমরা যা খুসি তাই ক'রেচি।

যখন খেলি তখন খেলাটাই হয় বড়ো, যার সঙ্গে খেলি তা'কে নজর করিনে।
এবার যদি সে ফেরে, তা'কে মুহূর্তের জন্যে অনাদর ক'র্‌বো না।
আমার মনে হচ্চে আমরা কেবলি তা'কে দুঃখ দিয়েচি।
তা'র ভালবাসা সব দুঃখকে ছাড়িয়ে উঠেছিলো।
সে যে কী সুন্দর ছিলো, যখন তা'কে চোখে দেখ্‌লুম তখন সেটা চোখে পড়েনি।

গান

চোখের আলোয় দেখেছিলেম
চোখের বাহিরে।
অন্তরে আজ দেখ্‌বো, যখন
আলোক নাহি রে।
ধরায় যখন দাও না ধরা
হৃদয় তখন তোমায় ভরা,
এখন তোমার আপন আলোয়
তোমায় চাহি রে।
তোমায় নিয়ে খেলেছিলেম
খেলার ঘরেতে।
খেলার পুতুল ভেঙে গেছে
প্রলয় ঝড়েতে।
থাক্ তবে সেই কেবল খেলা,
হোক্ না এখন প্রাণের মেলা,—
তারের বীণা ভাঙ্‌লো, হৃদয়-
বীণায় গাহি রে।

ঐ বাউলটা চুপ করে' বসে' থাকে, কথা কয় না, ভালো লাগ্‌চে না।

ও কেমন যেন একটা অলক্ষণ!

যেন কালবৈশাখীর প্রথম মেঘ।

দাও ভাই, দাও, ওকে বিদায় করে' দাও!

না, না, ও বসে' আছে তবু একটা ভরসা আছে।

দেখ্‌চো না ওর মুখে কিচ্ছু ভয় নেই!

মনে হ'চ্চে ওর কপালে যেন কি সব খবর আস্‌চে।

ওর সমস্ত গা যেন অনেক দূরের কা'কে দেখ্‌তে পাচ্চে। ওর আঙুলের আগায় চোখ ছড়িয়ে আছে।

ওকে দেখ্‌লেই বুঝ্‌তে পারি কে আস্‌চে অন্ধকারের ভিতর দিয়ে পথ করে'।

ঐ দেখ জোড়হাত করে' উঠে দাঁড়িয়েছে।

পূবের দিকে মুখ করে' কা'কে প্রণাম ক'র্‌চে।

ওখানে তো কিচ্ছুই নেই—একটু আলোর রেখাও না।

একবার জিজ্ঞাসাই করো না, ও কি দেখ্‌চে—কা'কে দেখ্‌চে! না, না, এখন ওকে কিছু বোলো না।

আমার কি মনে হচ্চে জান? যেন ওর মধ্যে সকাল হয়েছে।

যেন ওর ভুরুর মাঝখানে অরুণের আলো খেয়া নৌকোটির মতো এসে ঠেকেচে!

ওর মনটা ভোর বেলাকার আকাশের মতো চুপ।

এখনি যেন পাখীর গানের ঝড় উঠ্‌বে—তা'র আগে সমস্ত থম্‌থমে।

ঐ একটু একটু একতারাতে ঝঙ্কার দিচ্চে, ওর মন গান গাচ্চে।

চুপ করো, চুপ করো ঐ গান ধরেছে।

বাউলের গান

হবে জয়, হবে জয়, হবে জয়-রে

ওহে বীর, হে নির্ভয়!

জয়ী প্রাণ, চিরপ্রাণ,
জয়ী রে আনন্দগান,
জয়ী প্রেম, জয়ী ক্ষেম,
জয়ী জ্যোতির্ম্ময় রে ॥
এ আঁধার হবে ক্ষয়, হবে ক্ষয় রে,
ওহে বীর, হে নির্ভয়!
ছাড়ো ঘুম, মেলো চোখ,
অবসাদ দূর হোক্,
আশার অরুণালোক
হোক্ অভ্যুদয় রে ॥

ঐ যে!

চন্দ্রহাস, চন্দ্রহাস!

রোস্ রোস্ ব্যস্ত হোস্‌নে—এখনো স্পষ্ট দেখা যাচ্চে না! না, ও চন্দ্রহাস ছাড়া আর কেউ হ'তে পারে না।

বাঁচ্‌লুম, বাঁচলুম।

এসো, এসো চন্দ্রহাস!

এতোক্ষণ আমাদের ছেড়ে কী ক'র্‌লে ভাই বলো।

যাকে ধ'র্‌তে গিয়েছিলে তা'কে ধ'র্‌তে পেরেচো?

চন্দ্রহাস। ধ'রেচি, তা'কে ধ'রেচি।

কই তা'কে তো দেখ্‌চি নে।

চন্দ্রহাস। সে আস্‌চে—এখনি আস্‌চে।

কী তুমি দেখ্‌লে আমাকে বলো ভাই।

চন্দ্রহাস। সে তো আমি ব'ল্‌তে পার্‌বো না।

কেন?

চন্দ্রহাস। সে তো আমি চোখ-দিয়ে দেখিনি।

তবে ?

চন্দ্রহাস। আমার সব-দিয়ে দেখেছিলুম।

তা হোক্ না, বলো না ভাই।

চন্দ্রহাস। আমার সমস্ত দেহ মন যদি কণ্ঠ হ'তো ব'ল্‌তে পার্‌তো।

কা'কে তুমি ধ'রেচো তাও কি বুঝ্‌তে পার্‌লে না ?

জগতের সেই বিরাট বুড়োটাকে ?

যে বুড়োটা অগস্ত্যের মতো পৃথিবীর যৌবনসমুদ্র শুষে খেতে চায় ?

সেই যে ভয়ঙ্কর ? যে অন্ধকারের মতো ? যার বুকে দু'টো চোখ ?

যার পা উল্টো দিকে ? যে পিছনে হেঁটে চলে ?

নরমুণ্ড যার গলায় ? শ্মশানে যার বাস ?

চন্দ্রহাস। আমি তো ব'ল্‌তে পারিনে। সে আস্‌চে, এখনি তা'কে দেখ্‌তে পাবো।

ভাই বাউল, তুমি দেখেচো তা'কে ?

বাউল। হাঁ, এই তো দেখ্‌চি।

কই ?

বাউল। এই যে !

ঐ যে বেরিয়ে এলো, বেরিয়ে এলো।

ঐ যে কে গুহা থেকে বেরিয়ে এলো !

আশ্চর্য্য ! আশ্চর্য্য !

চন্দ্রহাস। এ কি, এ যে তুমি !

তুমি ! সেই আমাদের সর্দ্দার !

আমাদের সর্দ্দার রে !

বুড়ো কোথায় ?

সর্দ্দার। কোথাও তো নেই।

কোথাও না ?

সর্দ্দার। না।

তবে সে কি ?

সর্দ্দার। সে স্বপ্ন।

চন্দ্রহাস। তবে তুমিই চিরকালের ?

সর্দ্দার। হাঁ।

পিছন থেকে যারা তোমাকে দেখ্‌লে তা'রা যে তোমাকে কতো লোকে কতো রকম মনে ক'র্‌লে তা'র ঠিক নেই।

সেই ধূলোর ভিতর থেকে আমরা তো তোমাকে চিন্‌তে পারিনি।

তখন তোমাকে হঠাৎ বুড়ো বলে' মনে হ'লো।

তা'র পর গুহার মধ্যে থেকে বেরিয়ে এলে। এখন মনে হচ্চে যেন তুমি বালক।

যেন তোমাকে এই প্রথম দেখ্‌লুম !

চন্দ্রহাস। এ তো বড়ো আশ্চর্য্য ! তুমি বারে বারেই প্রথম, তুমি ফিরে ফিরেই প্রথম !

ভাই চন্দ্রহাস, তোমারই হার হ'লো। বুড়োকে ধ'র্‌তে পার্‌লে না।

চন্দ্রহাস। আর দেরি না—এবার উৎসব সুরু হোক। সূর্য্য উঠেচে।

ভাই বাউল, তুমি যদি অমন চুপ করে' থাক, তাহ'লে মূর্চ্ছিত হ'য়ে প'ড়্‌বে। একটা গান ধরো।

বাউলের গান

তোমায় নতুন ক'রেই পাবো বলে'
হারাই ক্ষণে ক্ষণ—
ও মোর ভালবাসার ধন।

দেখা দেবে বলে' তুমি
হও যে অদর্শন
ও মোর ভালবাসার ধন।
ও গো তুমি আমার নও আড়ালের,
তুমি আমার চিরকালের,
ক্ষণকালের লীলার স্রোতে
হও যে নিমগন,
ও মোর ভালবাসার ধন।
আমি তোমায় যখন খুঁজে ফিরি
ভয়ে কাঁপে মন—
প্রেমে আমার ঢেউ লাগে তখন।
তোমার শেষ নাহি, তাই শূন্য সেজে
শেষ করে' দাও আপনাকে যে,
ঐ হাসিরে দেয় ধুয়ে মোর
বিরহের রোদন—
ও মোর ভালবাসার ধন॥

ঐ যে গুন্ গুন্ শব্দ শোনা যাচ্চে।
শুন্‌চি বটে।
ও তো মধুকরের দল নয়, পাড়ার লোক।
তা'হলে দাদা আস্‌চে চৌপদী নিয়ে।

দাদা। সর্দ্দার না কি?

সর্দ্দার। কি দাদা?

দাদা। ভালোই হ'য়েছে। চৌপদীগুলো শুনিয়ে দিই।

না, না, গুলো নয়! গুলো নয়! একটা।

দাদা। আচ্ছা ভাই, ভয় নেই, একটাই হবে।

সূর্য্য এল পূর্ব্বদ্বারে তূর্য্য বাজে তা'র।
রাত্রি বলে, ব্যর্থ নহে এ মৃত্যু আমার,
এত বলি পদপ্রান্তে করে নমস্কার।
ভিক্ষাঝুলি স্বর্ণে ভরি' যায় অন্ধকার॥

অর্থাৎ—

আবার অর্থাৎ!

না, এখানে অর্থাৎ চ'ল্‌বে না।

দাদা। এর মানে—

না, মানে না! মনে বুঝ্‌বো না এই আমাদের প্রতিজ্ঞা।

দাদা। এমন মরিয়া হ'য়ে উঠ্‌লি কেন?

আজ আমাদের উৎসব।

দাদা। উৎসব না কি? তা'হলে আমি পাড়ায়—

চন্দ্রহাস। না, তোমাকে পাড়ায় যেতে দিচ্চিনে।

দাদা। আমাকে দরকার আছে না কি?

আছে।

দাদা। আমার চৌপদী—

চন্দ্রহাস। তোমার চৌপদীকে আমরা এমনি রাঙিয়ে দেব যে তা'র অর্থ আছে কি না আছে বোঝা দায় হবে।

সুতরাং অর্থ না থাক্‌লে মানুষের যে দশা হয় তোমার তাই হবে।

অর্থাৎ পাড়ার লোকে তোমাকে ত্যাগ ক'র্‌বে।

কোটাল তোমাকে ব'ল্‌বে অবোধ।

পণ্ডিত ব'ল্‌বে অর্ব্বাচীন।

ঘরের লোক ব'ল্‌বে অনাবশ্যক।

বাইরের লোক বল্‌বে অদ্ভুত।

চন্দ্রহাস। আমরা তোমার মাথায় পরাব নবপল্লবের মুকুট।

তোমার গলায় পরাব নবমল্লিকার মালা।

পৃথিবীতে এই আমরা ছাড়া আর কেউ তোমার আদর বুঝ্‌বে না।

সকলে মিলিয়া

উৎসবের গান

আয় রে তবে, মাত রে সবে আনন্দে
আজ নবীন প্রাণের বসন্তে!
পিছনপানের বাঁধন হ'তে
চল্‌ ছুটে আজ বন্যাস্রোতে,
আপনাকে আজ দখিন হাওয়ায়,
ছাড়িয়ে দে রে দিগন্তে,
আজ নবীন প্রাণের বসন্তে।
বাঁধন যতো ছিন্ন কর্‌ আনন্দে
আজ নবীন প্রাণের বসন্তে!
অকূল প্রাণের সাগর-তীরে
ভয় কিরে তোর ক্ষয়-ক্ষতিরে?
যা আছে রে সব নিয়ে তোর
ঝাঁপ দিয়ে পড়্‌ অনন্তে
আজ নবীন প্রাণের বসন্তে॥